এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে অনেকের মতভেদ হইতে পারে। তিনি হয়ত বলিবেন সমাজত্যাগীদের বিষয়ে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ ত্যাগ করা ও না করার বিচার কে করিবে? সকলের আদর্শ ত আর এক নহে। বিশেষতঃ এটা ইতিহাস, যাঁহার পরিচর্য্যায় সমাজ যতটা অগ্রসর, ইতিহাসে তিনি ততটাই সম্মানের স্থান অধিকার করিবেন, না দিলে অধর্ম্ম হয়। তিনি সমাজের গঠন কার্য্যে সংসারের পদমর্য্যাদা ও চরিত্র শোভার দিকটা দেখিয়াই পূর্ব্বোক্ত তিন মহাত্মাকে অবলম্বন করিয়া সাধারণ সমাজের প্রতিষ্ঠার গৌরব সম্ভোগ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ তিন প্রথিতনামা মহাত্মাদের শক্তির মিলনেই সমাজ গঠন কি সত্য সত্যই সম্ভবপর হইত? আমাদের বুদ্ধি বিবেচনায় কোনও ক্রমেই সম্ভবপর হইত না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকালে অপর দুইটী ব্যক্তির আত্মসমর্পণ ও সমাজ-সেবার এই নূতন কর্ম্ম-ক্ষেত্র রচনায় অগ্রসর না হইলে এ সমাজ শত আনন্দমোহন, শত শিবচন্দ্র ও শত উমেশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিত না। সেই দুই ব্যক্তির অন্যতম শাস্ত্রী মহাশয় নিজে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী, সাংসারিক শতবিধ উচ্চ আশা ভরসার অপূর্ব্বসুন্দর মানচিত্র নিয়ত সম্মুখে ভাসমান অর্থ, সম্পদ, মান মর্য্যাদা প্রভৃতি সাংসারিক শতবিধ সুখ সুবিধার প্রবল আকর্ষণ সম্মুখে বর্ত্তমান, এরূপ অবস্থায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া সাধারণ সমাজের সেবায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের আত্মবিসর্জ্জনই একটা প্রধান অংশ। অপরাংশ পরম পূজনীয় ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আমাদের বিশ্বাস সে সময়ে অর্থাৎ সাধারণ সমাজের প্রারম্ভ কালে গোস্বামী মহাশয়ের সহকারিতা যে অমৃত ফলের প্রসূতি হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

একদা প্রসঙ্গক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ আমার নিকট গোস্বামী মহাশয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় সে সময়ে ঢাকায় ছিলেন। আমি তাঁহাকে গোঁসাইয়ের ঠিক ঠিক সংবাদ জ্ঞাপন করিলে পর, মহর্ষি বলিয়াছিলেন "দেখ, এরূপ সরল সত্যপ্রিয় মানুষ আর আমার চক্ষে পড়িয়াছে কি না, মনে হয় না। বিজয়কৃষ্ণের সরল সত্যানুরাগ লোক-বিরল।" আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সর্ব্বপ্রথম সূচনায় গোস্বামী মহাশয়কেই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শিবচন্দ্র দেবের ন্যায় আদি হইতে ভারতবর্ষীয়, ও তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাকালে, কেশব চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ দলের এই একজন মাত্র সাধারণ সমাজে যোগ দিয়াছিলেন। গোঁসাই কেশব চন্দ্রের অন্তরঙ্গ ছিলেন, ইতিহাস হিসাবে প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক অধিক নিকটতর ছিলেন। যাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া সাধারণ সমাজের গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত লোকমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গোস্বামী মহাশয়। এমন সাধুপুরুষের প্রাথমিক সহকারিতা শাস্ত্রীমহাশয় একবারে পরিত্যাগ করিয়া তিনটী বিষয়ী লোকের মিলিত শক্তির সাহায্যে সাধারণ সমাজের সূচনার আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ভাব—ধর্ম্মাঙ্গ স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

বিষয়ী লোকদের সম্বন্ধে যে তীব্র বিরুদ্ধ

ভাব সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য ও প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, সে জন্য সাধারণ সমাজের সূচনা ও ক্রমোন্নতি ঈশ্বর-জ্ঞান-বিহীন অভক্তদিগের দ্বারা সাধিত বলিয়া, এটাকে সমাজ-সংস্কারকদল বলিয়া অভিহিত হওয়ার পক্ষে বিজয়কৃষ্ণের যোগদান ও বর্ত্তমানতা যে সাধারণ সমাজের ক্ষেত্রে প্রবল শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, ভক্তাগ্রগণ্য বিজয়কৃষ্ণ যে একাকী সে সময়ের সকল প্রচারক ও অচার্য্যের সঙ্গে তুলনায় কি ধর্ম্মজীবনে, কি চরিত্রে, কি বিনয় শিষ্টাচারে, সকল দিক দিয়া মহাশক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সে কথা আজ, সে প্রবল সত্য কথাটা আজ সাধারণ সমাজ ও শাস্ত্রীমহাশয় ভুলিতে পারেন, কিন্তু সত্য কখন চাপা পড়ে না। কালক্রমে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এ তত্ত্ব অবশ্যই দেখিতে ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। যদি ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মলাভের, মানবাত্মার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের স্থান বলিয়া ভবিষ্যতে স্বীকৃত হয়, ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুযায়ী ধর্ম্মসাধন যদি মানবাত্মার পক্ষে একটা উচ্চ পন্থা বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে এই সাধারণ সমাজের বর্ত্তমান বিষয়-ব্যাকুলতার প্রবল তরঙ্গ তুফানের তলদেশে সেই শান্ত মূর্ত্তি সাধু বিজয়কৃষ্ণকে তপস্যানিরত দেখিতে পাওয়া যাইবে। সাধারণ সমাজের গঠন ক্ষেত্রে সে বিশ্বাসী ভক্তসন্তানের পরিচর্য্যাই সর্ব্বোপরি জাগিয়া উঠিবে, এবং সে চরিত্র-চিত্র শাস্ত্রীমহাশয় না করিলেও, তাঁহার আনন্দ-মোহন, তাঁহার শিবচন্দ্র ও উমেশচন্দ্র গোঁসাই-জীর পদতলে ভক্তিতত্ত্বে বালকের ন্যায় আসীন দেখিতে হইবে। শাস্ত্রীমহাশয় ইতিহাস রচনায় অনেক স্থলেই "সোণা ফেলে আঁচলে গিরো" দিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ সমাজের বৃহদায়তন কটাহে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া যে অত্যুত্তম সরখানি পড়িয়াছিল, তাহা আর কাহাকেও ভোগ করিতে দিলেন না। লুকাইয়া রাখিলেন। ফলও তদ্রূপ ফলিতেছে।

এ ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন, আর সাধারণ সমাজের বর্ত্তমান উপদেষ্টা, আচার্য্য ও গুরুগণ দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহে রাজযোগ্য শয্যায় শয়ন করিয়া সাধারণ সমাজের ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, অনসনক্লিষ্ট ও রোগগ্রস্ত উপাসকমণ্ডলীর আত্মার অন্নপানের ব্যবস্থা করাই কি সঙ্গত মনে করিলেন? ইহা কি শোচনীয় দৃশ্য নহে? ইহাই কি শেষটা দেখিতে হইল? এই শ্রেণীর উপদেষ্টা ও গুরুর দলই কি বিধাতার বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রবল বারিধারা বহন করিয়া কুটীরে কুটীরে বিতরণ করিবেন? তাই বটে, তাহা না হইলে গোঁসাই কি ইতিহাসে এরূপ ভাবে লুক্কায়িত থাকেন?

শিষ্ট শান্ত সত্যবাদী ও সদাচারনিরত হইলেই এখন গুরু ও উপদেষ্টা হওয়া যায়, এই পথের পথপ্রদর্শক হইয়াই শাস্ত্রী মহাশয় ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই ইতিহাসে, বিশেষ ভাবে সাধারণ সমাজের ইতিহাসে, একটা প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা ও ধর্ম্মসাধনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। দারুণ উত্তপ্ত সাহারার ন্যায় চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে, আর আমরা ইহার কোনও পরিবর্ত্তন চেষ্টা না করিয়া কেবল উধাও হইয়া অর্থ সম্পদের পশ্চাতে ছুটিয়াছি, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। বলিলেই গালি দেওয়া হয়। যাহারা হৃদয়ে অসহ্য বেদনা অনুভব করিয়া এ সকল বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইবে, তাহারা মন্দ লোক। আরও চির-

কালই, এরূপ আচার বৈষম্যের প্রতিবাদ-পরায়ণ লোকমণ্ডলী উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। সে বিষয়ে ভয় করিয়া নিতান্ত অসঙ্গত আচরণ সকলের প্রশ্রয়দাতা হওয়া অপেক্ষা, গর্হিত কাজ আর কি হইতে পারে? আমরা এরূপ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি, তাই মুখ খুলিয়া এ সকল কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৬ পর্য্যন্ত গোঁসাই সাধারণ সমাজের আচার্য্য ও প্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যতদিন সমাজের সহিত মিলিত হইয়া প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন, সে সমস্ত সময়েই তিনি যখন কলিকাতায় উপস্থিত থাকিতেন, তখনই কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার পদমর্য্যাদা, তাঁহার সরল নিষ্ঠাপূর্ণ ধর্ম্মভাব ও বিনয় ভক্তি এতটাই সকলের সম্মান আকর্ষণ করিয়াছিল, তিনি লোকের এতটাই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর মাঘোৎসবের সময়ে ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে তিনি আচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট না হইলে, উপাসকমণ্ডলীর ব্যাকুল হৃদয়ের তৃপ্তি লাভ হইত না। সে সময়ে তিনি সাধারণ সমাজের লোকমণ্ডলীর মধ্যে বিনয় বৈরাগ্য আনয়নের জন্য নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে সাম্য, তাঁহার জীবন ও সে জীবন যাপনের পদ্ধতিতে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ যে সে সময়ের ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধু-হৃদয়ে এক পবিত্র সুন্দর ভাব আনয়ন করিয়াছিল, ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবনের সুবাতাসে বাস করিতে পাইয়া সে সময়ে কৃতার্থ হইয়াছিলাম, আজ এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য। তাঁহার মাঘোৎসবের প্রাতঃকালের উপাসনায় নর-নারী যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মস্খলিত মকরন্দ পানে মত্ত হইয়া সাধারণ-সমাজের মন্দির-দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিত, ইহাও আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি, হায়, আজ গভীর আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাসের কোনও স্থানে গোঁসাই কর্ত্তৃক সাধারণ সমাজের এই সর্ব্বোচ্চ ঐশ্বর্য্য ভোগের বিবরণের উল্লেখ নাই। আছে নিয়ম তন্ত্র গঠনের, আর সাধনাশ্রমের বিস্তৃত বিবরণ। আর আছে "The Ashram has had a remarkable history of its own. The record of experiences in connection with the practical application of the faith principle during the last twenty years, would be indeed interesting, fit to be placed by the side of the late George Muller's "Lord's Dealings." আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে, সাধারণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মসাধনাশ্রমের সংশ্রবে এই মহামূল্য তত্ত্ব অবগত হইতেছি। শাস্ত্রীমহাশয় অন্য নানা স্থানে নিজের সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করিলেও, তাঁহার আদরের সাধনাশ্রম যে George Mullerএর নিত্য-জীবন যাপনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে তুল্য মূল্যে দাঁড়াইয়াছে,আমরা এই সংবাদে উৎফুল্ল হইতে বাধ্য। এরূপ অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়া থাকিলে, গোস্বামী মহাশয়ের অকিঞ্চিৎকর বিবরণমালা পরিত্যক্ত হওয়ায়, বোধ হয় সাধারণ সমাজ ইতিহাস হিসাবে সত্যের অপলাপ করার অপরাধ হইতে ভগবদ্দৃষ্টিতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। ঈশ্বর সকল অপরা-

ধেরই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। তবে সাধারণ সমাজের ইতিহাসে গোঁসাইকে এরূপে চাকের বাঁয়া করিয়া চিত্র করাটা ভগবান ক্ষমা করিবেন কি না, বলিতে পারি না। আমার বোধ হয়, ইহাই সাধারণ-সমাজের মজ্জাগত রোগ। ভগবান আমাদিগকে এই রোগ হইতে মুক্ত করুন।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদিশূরের রাজধানী গৌড় কি বিক্রমপুর? (২)

গত শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা নব্যভারতে আদিশূরের রাজধানী গৌড় কি বিক্রমপুর ছিল, তৎসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এ বিষয় পক্ষপাতশূন্য হইয়া ঐতিহাসিক এবং তাম্রশাসন ও শিলালিপি সম্বন্ধীয় বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ সহকারে আলোচিত হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য ছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে যে যে প্রমাণের বলে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক এ পর্য্যন্ত যে পক্ষের প্রমাণ বলবত্তর, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। গত আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সেনগুপ্ত মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণগণ গৌড়নগরেই আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তালবেতাল ও বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি গল্পের উপর নির্ভর করিয়া এবং অনুমান ও কিম্বদন্তীর প্রাধান্য দেখাইয়া ইতিহাস, তাম্রশাসন, শিলালিপি ও কুলপঞ্জী প্রভৃতির প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যদি এতাদৃশ গল্পের দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয় তাহা হইলে ইহার আলোচনা না করাই ভাল। যে স্থলে ইতিহাস প্রভৃতির প্রমাণের সহিত কিম্বদন্তী ও অনুমানের সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য আছে এবং তাহা সম্ভবপর বোধ হয়, সেই স্থলেই অনুমান ও কিম্বদন্তী প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, নতুবা তাল বেতাল, বত্রিশ সিংহাসন ও সদৃশ গল্প গুলিকে ঠাকুর মার ঝুলীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখা উচিত। বরদা বাবু কেবল মাত্র কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ "তাল বেতালসিদ্ধ" উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের সাধন-ক্ষেত্র বিক্রমপুর যজ্ঞের প্রশস্ত ভূমি মনে করিয়া আদিশূরকে বিক্রমপুরে যাইয়া যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তদনুসারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ বিক্রমপুরে হইয়াছিল। প্রথমতঃ উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য কস্মিন্ কালে বিক্রমপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন কিনা এবং কিম্বদন্তীমূলক * বিক্রমপুরের স্থাপনকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য এক কিনা, তদ্বিষয়েই বিশ্বাস-যোগ্য কোন প্রমাণ নাই। বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিকগণের মতে আদিশূর কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, ইহা উপাধি মাত্র। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, প্রাচীন পৌণ্ড্র বর্দ্ধন নগরে জয়ন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এই জয়ন্তকেই "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" আদিশূর বলেন। রাঢ়ীয় ঘটক প্রধান বংশীবিদ্যা রত্নের প্রাচীন রাঢ়ীয় কুল-পঞ্জিকাতে আদিশূর-তনয় ভূশূর মহারাজ জয়ন্তের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ‡ রাজ-

* শূরেন চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেনচ।

তরঙ্গিণী ও কথাসরিৎসাগর মতে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন নগর গঙ্গার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। মালদহের অন্তর্গত বর্ত্তমান পাণ্ডুয়াই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং এই পৌণ্ড্র বর্দ্ধনই প্রাচীন গৌড়। গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়নগরেরও স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কালিন্দী তীরবর্ত্তী পিছলী গঙ্গারামপুর হইতে সাগরদীঘী পর্য্যন্ত বল্লাল বাড়ী, দ্বারবাসিনী, চণ্ডীপুর, পাতালচণ্ডী, গৌড়েশ্বরী প্রভৃতি নাম হইতেও তাহাদের ভগ্নাবশেষ হইতে অনুমিত হয় যে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে সেন রাজগনের সময়ে হিন্দু গৌড় এই সকল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। পাণ্ডুয়ার মধ্যে হোমদীঘী ও ধুমদীঘী নামে দুইটী দীঘী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তথায় জনপ্রবাদ যে, এই স্থানেই আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হইয়াছিল। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-প্রণেতা পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, আদিশূর-প্রদত্ত পঞ্চগ্রাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল। নগেন্দ্র বাবু বলেন যে "গৌড়াধিপ আদিশূর কোন কালে বিক্রমপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন কিনা, তাহারই বিশ্বাসজনক প্রমাণাভাব।" আর কাণ্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাহীন পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন কিনা, তাহাও সন্দেহ স্থল।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় শিলালিপির প্রমাণ বলে বল্লালসেনকে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় সম্ভূত বলিয়াছেন। বরদা বাবু এতাদৃশ প্রমাণের প্রতিও কটাক্ষ করিয়াছেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্র মতে আদিশূর অম্বষ্ঠ কায়স্থ। কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় যে একই জাতি, তাহা বোধ হয় বরদা বাবু এখনও স্বীকার করিতে চান না। বল্লালসেনের জাতি বিষয়ে ও কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে বরদা বাবু গৌড়রাজমালা, বিশ্বকোষ ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

এ পর্য্যন্ত যে সকল তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোন স্থানে সেন বংশীয় রাজগণ বৈদ্য বলিয়া উক্ত হন নাই। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় বল্লালচরিত নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বিজয় সেনের পুত্র বল্লালসেনকে বৈদ্য বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত বল্লাল-চরিতে এই শ্লোকটী আছে :—

বৈদ্য বংশাবত সোঽয়ং বল্লাল নৃপপুঙ্গবঃ।
তদযজ্ঞবা কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভং॥
গোপাল ভট্টনাম্নাচ তদ্রাজ শিক্ষকেনচ।
অন্ধরাজজ মানৈর্ব্বসুভিবা নৈবধিকশকেষু॥

অর্থাৎ এই শুভ বল্লালচরিত বৈদ্যরাজ বল্লালসেনের আজ্ঞানুসারে তাঁহার শিক্ষক গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক ১০০ × (৮+৫) = ১৩০০ শকে (১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত হইল। দানসাগরের প্রমাণ অনুসারে বিজয় নন্দন বল্লালসেন ১০৯১ শকে * (১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) দানসাগর রচনা করেন। তদনুসারে বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন দ্বাদশ শতাব্দীর লোক আর পার্ব্বতীশঙ্কর বাবুর বৈদ্যরাজ বল্লাল সেন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। বল্লালচরিত কিরূপ প্রামাণ্য গ্রন্থ, তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু বৈদ্য বংশীয় কোন বল্লাল সেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিলে তিনি যে বিজয়তনয় বল্লালসেন নহেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেক দিন হইল ৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ঢাকার পুরাতন কাহিনীতে লিখিয়াছিলেন যে, "কয়েক বৎসর

* পূর্ণে শশিনব দশমিতে শকে দানসাগরো রচিতঃ।

হইল কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সেন রাজাগণের এক শাখা মুসলমানদিগের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া বিক্রমপুর হইতে পলাবে গমন করেন। রূপসেন এই দলের অধিনায়ক ছিলেন। ইহার এক শাখা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদের বংশধরেরা এক্ষণে কাশ্মীরের অন্তর্গত কাষ্টেবর নামক স্থানে বাস করিতেছে। অপর শাখা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে অসম্মত হইয়া, বাবুসেনের নেতৃত্বে পূর্ব্বোক্তবস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কাল ক্রমে বাবুসেনের বংশধরেরা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া এক শাখা সুখেত ও অপর শাখা মাণ্ডী রাজ্যের আধিপত্য লাভ করে। ইহারা আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ও গৌড়ের সেন রাজবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মাণ্ডীর বর্ত্তমান রাজার নাম বিজয়সেন।" সেনরাজগণের জাতি সম্বন্ধে এতদপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বরদা বাবু আদিশূর ও বল্লাল সেনের বংশাবলীর এক অভিনব তালিকা প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ তালিকা কোন প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে বা কোন আধুনিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে দৃষ্ট হয় না। বিশিষ্ট প্রকারাভাবে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং কাহারও কাহারও মতে ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ রাজ্য মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। দানসাগর মতে অন্ততঃ ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বল্লাল সেন জীবিত ছিলেন। তাঁহার পর ৩৩।৩৪ বৎসর সময়ের মধ্যে ঐতিহাসিকগণ একমাত্র লক্ষ্মণ সেনের দীর্ঘ রাজত্বেরই সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারেন না, আর বরদাবাবু ইহার পরেও তিনজন রাজার রাজত্ব কাল ধরিতেছেন। এতদ্ব্যতীত আজকাল লাক্ষ্মণ্য সেন নামক কোন রাজা বঙ্গ দেশে রাজত্ব করিতেন বলিয়া কোন লেখক স্বীকার করেন না। পণ্ডিত রামগতি-ন্যায়রত্ন মহাশয় ষ্টুয়ার্টের বঙ্গেতিহাস অবলম্বনে তাহাতে লিখিত লছমনিয়াকে স্বপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে লাক্ষ্মণ্য সেন নামে উল্লেখ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ বেহার ও পশ্চিমাঞ্চল-প্রচলিত লছমনিয়া নাম যে লক্ষ্মণ নামের অপভ্রংশ ও ঘৃণাসূচক নাম তাহা বুঝিতে পারিয়া লাক্ষ্মণ্য সেন নামক কোন রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং বহুদিন হইল, এই নাম বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

স্কন্ধাবার অর্থ লইয়া বরদাবাবু প্রকারান্তরে তাঁহার ভারতভ্রমণের গৌরব ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত যে, ভারত-ভ্রমণ ব্যক্তি বিশেষের একচেটিয়া নহে। তাঁহার অবগতির জন্য আমরা একমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার বর্ণিত অনেক গুলি স্থানেরই দর্শন লাভ আমাদের ক্ষুদ্র ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কিন্তু স্কন্ধাবার শব্দের অর্থ ও তৎসম্বন্ধীয় বহুদর্শিতার জন্য রাজপুতানা প্রভৃতি দূর প্রদেশে যাইবার প্রয়োজন করে না। ঘরে বসিয়া সংস্কৃত বা বাঙ্গালা অভিধান খুলিলেই তাহার অর্থ জানা যাইতে পারে। স্কন্ধাবার অর্থ Fortified city, দুর্গবদ্ধ নগর নহে। সৈন্য, শিবির ও রাজধানীই ইহার অভিধানগত অর্থ। আর যদি তর্কের অনুরোধে বরদাবাবুর স্বকপোল-কল্পিত অর্থই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলেও তাঁহাকে অনুরোধ করি যে, তিনি

দূর দেশে না যাইয়া নিকটবর্ত্তী সেই অরণ্যানি-সমাকীর্ণ প্রাচীন গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দর্শন করুন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, রাম পালের তুলনায় গৌড়নগর কিরূপ দুর্গবদ্ধ নগর ছিল। প্রাচীন কালে রাজাদিগের একাধিক স্কন্ধাবার বা রাজধানী ছিল। বিক্রমপুরেও বল্লালসেনের তদ্রূপ সাময়িক রাজধানী ছিল। কিন্তু আলোচ্য স্থলে স্কন্ধাবার শব্দ কে সাময়িক * রাজধানী বা শিবির অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার স্পষ্টতর প্রমাণ স্বরূপ "ধার্য্যগ্রাম পরিশর সমাবাদিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ," "জম্বুগ্রাম পরিশর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ," "স্কন্ধগ্রাম পরিশর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ" প্রভৃতি কয়েকটী দৃষ্টান্ত সেনরাজগণের তাম্রশাসন হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। রমাবাবু ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বিক্রমপুর ব্যতীত বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপেও বিশ্রাম ভবন স্থাপন করেন, দানসাগর ও মুসলমান ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু গৌড় নগরেই তাহাদের প্রকৃত রাজধানী ছিল। লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ধোয়ীকবি-বিরচিত পবন দূত নামক কাব্য হইতে আমরা জানিতে পারিব যে গঙ্গার কালিন্দী-সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী গৌড়ান্তর্গত বিজয়পুর নামক স্থানে লক্ষ্মণসেন তাঁহার অভ্রভেদী সপ্ততল রাজপ্রাসাদ ও অর্দ্ধনারীশ্বরদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিজয়পুর সম্ভবতঃ বিজয়সেনের নামানুসারে কথিত হইয়াছিল। মুসলমান ইতিহাসেও দৃষ্ট হয় যে, লক্ষ্মণসেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী নগর নানাবিধ সৌধমালায় ও প্রশস্ত রাজপথে সুসজ্জিত ছিল। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" লেখক বলেন যে, লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্ন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটী গৌড়নগরে লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বার-দেশে লিখিত ছিল। রূপ ও সনাতন গোস্বামী ইহা দেখিয়াছিলেন :—

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ॥

বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত কেবল গল্প ও কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রতিবাদ লিখিত হইলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন হইবে। শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

সাংখ্যসূত্র।

চতুর্থ অধ্যায়,—আখ্যায়িকা।

১। তত্ত্ব উপদেশ হইতে বিবেক জ্ঞান হয়। যেমন এক রাজপুত্রের হইয়াছিল।

কোন কারণে এক রাজা তাহার শিশু পুত্রকে বনে পাঠান। এক চণ্ডাল তাহাকে প্রতিপালন করে। তাহাতে রাজপুত্রের ক্রমে ধারণা হয় যে, সে চণ্ডাল। পরে যখন সে জানিতে পারে যে, সে রাজপুত্র, তখন তাহার চণ্ডালত্ব অভিমান দূর হয়। সেই পুরুষ অসঙ্গ নিরঞ্জন এই উপদেশ হইতে আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে।

"গ্রহাবিষ্টো দ্বিজঃ কশ্চিৎ
শূদ্রোঽহং ইতি মন্যতে।

* বর্ত্তমান সময়ের জমীদারদিগের কাছারীবাড়ী ও পরিদর্শক কর্ম্মচারীদিগের Circuit houseর ন্যায়।

গ্রহনাশাৎ পুনঃ স্বীয়ং
ব্রাহ্মণ্যং মন্যতে যথা॥
মায়াবিষ্টস্তথা জীবো
দেহোঽহং ইতি মন্যতে।
মায়ানাশাৎ পুনঃ স্বীয়ং
রূপং ব্রহ্মাস্মি মন্যতে॥"
ইতি গড়ুর পুরাণ।

২। যে তত্ত্বোপদেশ অন্যকে দেওয়া হয়, তাহা শ্রবণ করিলেও জ্ঞান হইতে পারে। এক পিশাচের এইরূপ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

ইহা মহাভারতের উপাখ্যান। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিয়া এক পিশাচ মুক্ত হয়; স্ত্রী শূদ্রও এইরূপে উপদেশ শ্রবণ করিয়া মুক্ত হইতে পারে।

৩। উপদেশ বার বার আবৃত্তি হইতে জ্ঞান হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, শ্বেতকেতুকে তাহার বৈরাগ্য উৎপাদন জন্য আরুণি বার বার উপদেশ করিয়াছিলেন।

৪। (সুহৃদের উপদেশেও জ্ঞান হয়।) যেমন একপিতা পুত্র পরস্পরের সম্বন্ধজ্ঞানিত না, সুহৃদের উপদেশে উভয়ে তাহা জানিয়াছিল।

একজন গর্ভিনী ভার্য্যাকে রাখিয়া বিদেশে যায়, বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসে ও বন্ধুর কথায় পুত্রকে চিনিতে পারে। (অগ্নিঃ)

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, পিতা পুত্র রূপে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ অনুমান করে। এ অর্থ সঙ্গত নহে।

৫। বিয়োগে দুঃখ হয়, ত্যাগ করিতে পারিলে সুখী হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত শ্যেন পক্ষী।

পোষা পাখীকে ছাড়িয়া দিলে সে সুখী হয়, অথচ প্রভুর বিয়োগে দুঃখী হয়। অতএব সুখ সকল দুঃখ মিশ্রিত বলিয়া হেয়। (অগ্নিঃ)

অনিচ্ছার বিষয় হইতে বিচ্যুত হইলে দুঃখ হয়। ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্যাগে সুখ হয়। শ্যেন পক্ষীর গৃহীত মাংস খণ্ড অপরে কাড়িয়া লইলে, তাহার দুঃখ হয়, আর যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্যাগ করে, তবে সে দুঃখিত হয় না।

শাস্ত্রে আছে—

"সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলি লেমুস্ত নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমাপতি॥
নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনি যথা।
তথা ত্যজ্যমিমং দেহং কৃচ্ছ্রাদ গ্রাহ্যাৎ
বিমুচ্যতে॥" (মনু)।

৬। সর্পের ত্বকের মত এই ত্যাগ করিতে হইবে।

সাপ খোলসকে ত্যজ্য বোধে ত্যাগ করে, তাহাতে আর মমতা করে না।

'জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ।'

সেইরূপ বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে।

অনিরুদ্ধের অর্থ এক সাপ এই ত্যক্ত খোলসের উপর মমতা করিয়া সে স্থান ত্যাগ করে নাই। এক সাপুড়ে সেই খোলস দেখিয়া তাহার সন্ধান পাইয়া সে সাপকে ধরিয়াছিল। অতএব ত্যজ্য বিষয়ে মমতা করিলেও দোষ হয়।

৭। অথবা ছিন্ন হস্তের মত ত্যাগ করিতে হইবে।

এক মুনি চুরির জন্য হস্ত ছেদন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। অর্থাৎ অকার্য্য দৈবাৎ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (অগ্নিঃ)

ইহার সহজ অর্থ এই যে, হস্ত ছিন্ন হইলে যেমন তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়, বিষয়ের সহিতও সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তাহা ত্যাগ করিতে হয়।

৮। যাহা সাধনার অন্তরায়, তাহার অনুচিন্তা ভরতের ন্যায় বন্ধনের কারণ হয়।

ভরতঋষির হরিণ শিশু পালন করিতে গিয়া সমাধি ভঙ্গ হইয়া ছিল, মৃত্যুকালে হরিণকে চিন্তা করিয়া পরজন্মে হরিণ হইয়াছিলেন।

৯। বহুর সহিত সঙ্গ করিলে বিরোধ ও রাগাদি জন্মে, তাহা বন্ধনের কারণ হয়। দৃষ্টান্ত শঙ্খ।

(যেমন কুমারীর হস্তে অনেক শঙ্খ (শাঁকের চুড়া) থাকিলে, তাহাদের সংঘর্ষে শব্দ হওয়ায় সে কুটুম্বদের মধ্যে লজ্জিত হয়, এক এক গাছি থাকিলে আর লজ্জিত হইতে হয় না, তেমনি, যোগী বহু লোকের সঙ্গ করিলে, তাহার মনে ক্রোধ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। যোগীর একা থাকাই সঙ্গত।

১০। দুইজনের সঙ্গও সেইরূপ (পরিহার্য্য)

"বাসে বহুনাং কলহোভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কনং॥

১১। যাহার আশা নাই, সেই সুখী;—যেমন পিঙ্গলা।

(পিঙ্গলা নাম্নী কোন নারী রাত্রে যতক্ষণ পতি আগমন আশা করিতেছিল, তাহার ততক্ষণ নিদ্রা হয় নাই, উৎকণ্ঠা ছিল। যখন রাত্রি শেষে বুঝিল যে সে আর আসিবে না, তখন নিরাশ হইয়া সুখে নিদ্রা গেল।)

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥

চিত্ত সত্ত্বপ্রধান, সুতরাং স্বভাবতঃ সুখস্বরূপ। এই সুখ আশা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাই আশা নিবৃত্তিতে সুখ প্রকাশ পায়। (বিঃ ভিঃ)

১২। আরম্ভ বিনা সুখী হওয়া যায়। যেমন সর্প পরগৃহে সুখী থাকে।

আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্মচেষ্টা। মুমুক্ষু ব্যক্তি বাসার্থ গৃহের আর আরম্ভ করিবে না। সর্প ইন্দুরের গৃহে সুখে বাস করে, মুমুক্ষুও সেই রূপ পরগৃহে সুখে থাকিতে পারে।

"গৃহারম্ভো হি দুঃখায় ন সুখায় কথঞ্চন।
সর্পঃ পরকৃতং রন্ধ্রং প্রবিশ্য সুখমেধতে॥"
"সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী" ইতি গীতা।

এস্থলে আরম্ভ অর্থে সাধারণ সংকল্প পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আরম্ভ বুঝিতে হইবে। যাহার কোন কামনা নাই, তাহার কোনরূপ সংকল্প করিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিবার প্রয়োজনও নাই। কর্ম্ম চেষ্টাই দুঃখের মূল। আরম্ভ ত্যাগ করিলে আর দুঃখের কারণ থাকে না, সুখী হওয়া যায়।

১৩। শাস্ত্র গুরু উপাসনাদি অনেক থাকিলেও তাহার সার মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন ভ্রমর।

ভ্রমর পুষ্প হইতে কেবল মধুই গ্রহণ করে। বহুবিধ শাস্ত্র দর্শন পূর্ব্বক গুরু উপাসনা দ্বারা যাহা সার উপদেশ, তাহাই গ্রহণ করিবে। (বিঃ ভিঃ)

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলঃ নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—

"সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ স্বার্থসাধকং।
জ্ঞানানাং বহুতা চেষ্টা চেতা যোগবিঘ্নকরী হিসা।
ইদং জ্ঞেয় মিদং জ্ঞেয় ইতি যদ্ধিতশ্চরেৎ।
অসৌ কল্প সহস্রেষু নৈব জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥

১৪। একাগ্রচিত্তের সমাধিস্থানি হয় না। দৃষ্টান্ত ইষুকার।

ইষুকার শরনির্ম্মাণ কর্ত্তা। একাগ্রমনে শরনির্ম্মাণ করার সময়, যেমন সমীপবর্ত্তী রাজাকে সে দেখিতে পায় নাই, তেমনই একাগ্র হইলে বাহ্য জগৎ জ্ঞান থাকে না।

"তদৈব মাত্মন্যবরুদ্ধ চিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিৎ বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিঃ ব্রজন্তং
ইষৌ গতাত্মনা ন দদর্শ পার্শ্বে।

১৫। শাস্ত্রকৃত নিয়ম লঙ্ঘনে অনর্থ হয়,—যেমন বেদ বিরোধ হয়।

শাস্ত্রে যে যাগাদির যে নিয়ম উল্লিখিত আছে, তাহা লঙ্ঘনে অর্থসিদ্ধি বা যোগ লাভ হয় না। যেমন জ্যোতিষ্টোম নিয়ম লঙ্ঘনে ফল হয় না। (ঔদাদি সেবনের নিয়ম লঙ্ঘনে ঔষধের ফল হয় না) ইহা প্রত্যক্ষ।

বিজ্ঞানভিক্ষুর পাঠ "কৃত নিয়ম—"

অনিরুদ্ধের পাঠ—"বত নিয়ম—"

অনিরুদ্ধের অর্থ—"ব্রতাদি পরিত্যাগে লোকদৃষ্টান্ত জ্ঞানরূপ প্রয়োজন নষ্ট হইয়া যায়। ইহা সঙ্গত নহে। স্মৃতিতে আছে,—

অপেত ব্রতকর্ম্মাতু কেবলং ব্রহ্মণি স্থিতঃ।

ব্রহ্মভূয়শ্চরন লোকে ব্রহ্মচারীতি কথ্যতে।

বিষ্ণু পুরাণাদিতে বৃথা কর্ম্মত্যাগীকে পাষণ্ড বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

১৬। তাহা বিস্মরণ হইলেও অর্থসিদ্ধি হয় না। দৃষ্টান্ত এক ভেকী।

একটী গল্প আছে। এক রাজা মৃগয়ার্থ বনে গিয়া এক সুন্দরী কন্যা দেখিলেন। শুনিলেন, সে ভেকরাজ কন্যা। রাজা বিবাহার্থী হইলেন। কন্যা বলিল, আমাকে জলে নামিতে দিবেন না। তাহা হইলে আর আমি উঠিব না। রাজা প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বহুদিন পরে তিনি সে প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গেলেন। একদিন বড় ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কন্যা অবগাহন ইচ্ছা করিল। রাজা সম্মতি দিলেন ও জল দেখাইয়া দিলেন। কন্যা অবগাহন করিল, আর উঠিল না। তখন রাজার আর দারের অবধি রহিল না।

১৭। পরামর্শ ব্যতীত কেবল উপদেশে কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত বিরোচন।

পরামর্শ অর্থাৎ মনন, গুরুবাক্য তাৎপর্য্য নির্ণয় জন্য বিচার।

শ্রুতিতে আছে, ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ব্রহ্মার কাছে যান। বিরোচন উপদেশ শ্রবণ করিয়া আর তাহা বিচার করেন না, এজন্য তাহার জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু ইন্দ্র তাহা মনন ও বিচার করায় ক্রমে তত্ত্ব জ্ঞানলাভ করেন।

(ছান্দোগ্য উপনিষৎ দ্রষ্টব্য।)

গুরু কি অভিপ্রায়ে কোন্ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। ভাবার্থ না বুঝিলে ভ্রান্তি দূর হয় না। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের নানার্থ দেখা যায়। তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয় না করিলে কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। (বিঃ ভিঃ)

১৮। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ইন্দ্র কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

তিনি পরামর্শ করিয়া বিচার করিয়া ক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র দেবরাজ আর বিরোচন অসুররাজ। উভয়ে ব্রহ্মার নিকট তত্ত্বোপদেশ লাভ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। উভয়েই আত্মা কি, ইহা জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা প্রথমে বলিলেন, এই দর্পণে তোমরা যে প্রতিবিম্ব দেখিতেছ, ইহাই তোমাদের আত্মা। বিরোচন ইহা হইতে বুঝিলেন, দেহই আত্মা।

ইন্দ্র বিচার করিয়া ইহার অর্থ না বুঝিয়া ব্রহ্মার নিকট আবার গেলেন, তখন ব্রহ্মা তাহাকে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

১৯। ইন্দ্রের ন্যায় (গুরুকে) প্রণাম, ব্রহ্মচর্য্য ও সেবা করিলে বহু কাল পরে সিদ্ধি হয়।

ব্রহ্মচার্য্য-বেদাধ্যয়ন।

উক্ত ইন্দ্র বিরোচন সংবাদে যানা যায় যে, ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ও তপস্যা করিয়াছিলেন। তবে তিনি সিদ্ধ হন। বহুকালে শ্রবণ মনন ও ধ্যান করিয়া তবে তিনি সিদ্ধ হন। শ্রুতিতে আছে,—

যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

গীতায় আছে,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনং তত্ত্বদর্শিনঃ।

২০। সিদ্ধির কাল নিয়ম নাই। দৃষ্টান্ত বামদেব।

পূর্ব্বজন্মের ঘটনা সকল গর্ভাবস্থায়ই জানিয়া বামদেব ঋষির জ্ঞানোদয় হইয়াছিল। তিনি শীঘ্রই মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রুতিতে আছে—

অদ্বৈতং পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ
প্রতিপেদেঽহং মনুরভবান্।
সূর্য্যশ্চেতি তদিদমপ্যেতর্হি
য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি।

"স ইদং সর্ব্বং ভবতি—ইতি।" আমি মনু—হইয়াছি—ইহার অর্থ ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিকতা প্রযুক্ত আমি সর্ব্বময় হইয়াছি। স্মৃতিতে আছে,

"সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বং।"

২১। যজ্ঞোপাসকদিগের ন্যায়, অধ্যস্ত রূপ উপাসনা হইতে পরম্পরা ক্রমে সিদ্ধি হয়।

ধর্ম্ম কেহ দেখে নাই, তথাপি ধর্ম্মলাভ উদ্দেশে যজ্ঞোপাসনা করা হয়। এস্থলেও গুরুদ্বারা যেরূপ অধ্যস্ত ও উপদিষ্ট হয়, তাহার স্বরূপ উপাসনা হইতে পরম্পরা ক্রমে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। (অনিঃ)

"সদৃশা দৃষ্ট চিন্তাদ্যাঃ স্মৃতিবীজস্য বোধকাঃ।
অতো নাতিপ্রসঙ্গোঽস্তি স্বপ্নাদৌ ভাবভাবনাৎ॥"

সগুণ উপাসনা মুখ্য জ্ঞানহেতু নহে। অধ্যস্তরূপ পুরুষ—অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু হরি প্রভৃতির উপাসনা হইতে পরম্পরা ক্রমে ব্রহ্মাদি লোক প্রাপ্তি ও ক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান নিষ্পত্তি হয়, সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় না। যাজ্ঞিকদিগেরও সেই নিয়ম। (বিঃ ভিঃ)

২২। ইতর (স্বর্গাদি) লাভ হইলেও আবার আবৃত্তি হয়। পঞ্চাগ্নি যোগে জন্ম হয়—ইহা শ্রুতিতে আছে।

শ্রুতিতে আছে—

"যথেহ কর্ম্মচিতো লোক ক্ষীয়তে।
ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ
"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া—ধনেন ত্যাগেনৈকে
অমৃতত্বমানশুঃ।"

আত্মা নির্গুণ, তাহা হইতে ভিন্ন, তাহাতে অধ্যস্ত ব্রহ্মাদি লোক পর্য্যন্ত রূপ লাভ করিলেও—আবার আবৃত্তি আছে। অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। যে দেববান পথে ব্রহ্মলোকে যায়, সেও পুণ্যক্ষয়ে আবার চন্দ্র, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, স্ত্রী, এই পঞ্চাগ্নির মধ্য দিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠক দ্রষ্টব্য। (বিঃ ভিঃ)

ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই পঞ্চাগ্নি-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে।

ইহাকে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা বলে। জীব পরলোকে স্বর্গাদি ভোগের পর পুণ্য ক্ষয়ে আবার যখন পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তখন কি উপায়ে সেই পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহা এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় বিবৃত হইয়াছে। দেবগণ অন্তরীক্ষ রূপ অগ্নিতে যজ্ঞ করেন, তাহা হইতে সোমের উৎপত্তি হয়। এইরূপ দেবগণের যজ্ঞদ্বারাই জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়। এই যজ্ঞ ফলে স্বর্গ-ভ্রষ্ট জীব প্রথমে সোমের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইতে সেই জীব বীজ বৃষ্টি সহিত মিলিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। সেই বৃষ্টি হইতে সে ওষধি প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া আমাদের অন্নের সহিত মিলিত থাকে, সেই অন্ন পুরুষ গ্রহণ করিলে তাহা রেতরূপে পরিণত হয়। সেই রেত স্ত্রীগর্ভে নিষিক্ত হইয়া জীবের উৎপত্তি হয়। ইহাই সংক্ষেপে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা।

২৩। বিরক্ত পুরুষ হেয় ত্যাগ করিয়া, কেবল যাহা উপাদেয়, তাহা গ্রহণ করিবে। যেমন হংস অসার জল ত্যাগ করিয়া সার দুগ্ধই গ্রহণ করে।

হেয়—প্রকৃতি, উপাদেয়—পুরুষের স্বরূপ মোক্ষ।

২৪। হংসের ন্যায় অতিশয় শক্তি লাভ করিলে এইরূপ উপাদেয় গ্রহণ সম্ভব হয়।

এই জল হইতে জলের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ গ্রহণ হংসের বিশেষ শক্তি, অন্য পক্ষী তাহা পারে না। সেইরূপ, বিশেষ সাধন শক্তি ব্যতীত কেহ বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, যাঁহারা অতিশয় জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিলেও ইহা সিদ্ধি হয়।

২৫। রাগ উপস্থিত হইলে আর কামচারী হইতে নাই। দৃষ্টান্ত শুক।

একবার বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইলে আর বিষয় সঙ্গ করিতে নাই। দৃষ্টান্ত শুক।

বীতরাগ শুকদেবের মুক্তি হইয়াছিল। তিনি কামাচারী ছিলেন না। (অণিঃ)

বিরক্ত ব্যক্তি আর বিষয়ের অথবা বিষয়ীর সহিত সঙ্গ করিবে না। তাহা হইলে কামাচারী শুক পক্ষীর ন্যায় আবার ব্যাধ রূপ বিষয় দ্বারা বা গুণ রূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইতে হয়। অথবা যাহার রাগ বা বিষয়ানুসরণ দূর হইয়াছে, সে আর যে বিষয়ানুরাগী বা কামাচারী তাহার সহিত সঙ্গ করিবে না। (বিঃ ভিঃ)

২৬। তাহা হইলে শুকের ন্যায় গুণযোগে বদ্ধ হইতে হয়।

গুণ—প্রকৃতির ত্রিগুণ। অথবা, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির আসক্তি সংক্রমণ রূপ গুণ।

সৌভরী মুনি এইরূপে বলিয়াছেন,—

"স মে সমাধিজ্জলবাসমিত্র
মৎসস্য সঙ্গাৎ সহসৈব নষ্টঃ।
সবিগ্রহঃ সঙ্গকৃতো মমায়ং
পরিগ্রহোন্মাশ্চ মহা বিঘিৎসাঃ॥"

যেমন পক্ষী রজ্জু যোগে বদ্ধ হয়, তেমনই বাগাদি দ্বারা পুরুষ বদ্ধ হয়।

২৭। ভোগ হইতে রাগ (বিষয়-ভোগানুরাগ শান্তি হয় না। যেমন মুনির হয় নাই।

মুনি—উক্ত সৌভরি মুনি। কশ্যপ ইত্যাদি। সৌভরি বলিয়াছিলেন,—

"আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানাং
অন্তোঽস্তি বিজ্ঞাত মিদং ময়াদ্য।
মনোরথাসক্তি পরস্য চিত্তং
ন জায়তে বৈ পরমার্থ সঙ্গি॥"

স্মৃতিতে আছে,—

"ন জাতু কাম কামানাং উপভোগেন
সাম্যতি।"—

২৮। উভয়ের দোষ দর্শন করিলেই শান্তি হয়।

উভয়ের—অর্থাৎ আত্মার ও বিষয়ের (অগ্নিঃ)। প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য—উভয়ের। দোষ অর্থাৎ পরিণামিত্ব দুঃখাত্মকত্ব প্রভৃতি দোষ। (বিঃ ভিঃ)

সৌভরি মুনি বলিয়াছেন :—

"দুঃখং যদেবৈকশরীরজন্ম
তথার্দ্ধসংখ্যং তদিদং প্রসূতং।
পরিগ্রহেণ ক্ষিতিপাত্মজানাং ,,
সূতৈরনেকৈর্বহুলীকৃতং তৎ॥"

২৯। মলিন চিত্তে উপদেশ বীজের আর উৎপন্ন হয় না। দৃষ্টান্ত অজ।

যাহাদের চিত্ত রাগাদি দোষে মলিন, সেই চিত্তে উপদেশরূপ জ্ঞানবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত অজ।

অজ রাজার ভার্য্যা ইন্দুমতীর মৃত্যুতে যে শোক, তাহা বশিষ্ঠাদির উপদেশেও দূর হয় নাই।

৩০। মলিন দর্পণের ন্যায় মলিন চিত্তে তত্ত্বোপদেশের আভাস বা ছায়া-মাত্রও পড়ে না।

মলিনচিত্ত—বিষয়রূপ রস দ্বারা মলিন চিত্ত।

৩১। প্রতিবিম্ব পড়িলেও তাহা সে বিম্বের অনুরূপ হয়। দৃষ্টান্ত পঙ্কজ।

মূলে আছে, তজ্জ—অর্থাৎ সেই উপদেশ জাত জ্ঞান। মলিন্ চিত্তে উপদেশ বিকৃত হয়। বিষয়ানুরাগীর চিত্তে উপদেশ শ্রবণে, যে উপদেশ অনুরূপ ফল উৎপন্ন হয় না। যেমন দূষিত কর্দ্দমে উত্তম বীজ রোপণ করিলে, তাহার অঙ্কুর ও পুষ্প বিকৃত হয়।

৩২। উপাস্যের সিদ্ধির ন্যায় বিভূতি যোগেও কৃতকৃত্যতা হয় না।

যেমন উপাস্য দেবতা প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিতে মোক্ষ হয় না, তেমনি ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি (অষ্টসিদ্ধি) লাভ করিলেও মোক্ষ বা কৃতকৃত্যতা লাভ হয় না।

ব্রহ্মা হরি হর প্রভৃতি যাঁহারা আমাদের উপাস্য দেবতা, তাঁহারা সাংখ্যমতে সিদ্ধ পুরুষ। তাঁহারা মুক্ত নহেন। তাঁহাদের উপাসনা দ্বারা তাঁহাদের ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিলেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবলোক মাত্র লাভ হয়। সংসার হইতে একেবারে মুক্ত হওয়া যায় না। এজন্য উপাস্য দেবতার ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া যে ঐশ্বর্য্য হয়—তাহাতে কৃতকৃত্যতা বা মোক্ষ হয় না। কেননা, তাহার পর আবার দুঃখযোগ হয়। সেইরূপ যোগজ অষ্টসিদ্ধি লাভেও পরমার্থ সিদ্ধি হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়—সার সংগ্রহ।

(ক)

জ্ঞানের সাধনা।

(১)	উপদেশ গ্রহণ	১-৪
(২)	ত্যাগ	
	বিষয় ত্যাগ	৫-৭
	সাধনার অন্তরায় ত্যাগ	৮
	সঙ্গ ত্যাগ	৯-১০
	আশা ত্যাগ	১১
	আরম্ভ ত্যাগ	১২
(৩)	উপদেশের সার গ্রহণীয়	১৩
(৪)	একাগ্রতা অভ্যাস	১৪
(৫)	নিয়ম পালন	১৫

(৬) উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ ১৬
(৭) উপদেশ বিচার ১৭-১৮
(৮) তাহার জন্য গুরুসেবা ১৯
(৯) সিদ্ধির কাল নিয়ম নাই ২০
১০। অভ্যস্ত উপাসনায় ক্রমমুক্তি ২১

(খ)

ইতর সিদ্ধি হেয়।

(১১) ইতর লাভ (স্বর্গাদি) ইচ্ছা ত্যাগ ২২
(১২) উপাদেয় মাত্র গ্রহণ ২৪-২৪
(১৩) কামচারিত্ব ও ভোগ ত্যাগ ২৫-২৮
(১৪) চিত্ত মলিন থাকিলে সিদ্ধি হয় না ২৯-৩১
(১৫) উপাস্যে দেবতা প্রাপ্তি ও ঐশ্বর্য্য রূপ নিম্ন সিদ্ধি ত্যাগ ১৩

চতুর্থ অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব।

১। উপদেশ গ্রহণ ১।৩।৬।৭।৮
২। একাগ্রতা অভ্যাস ও নিয়ম পালন ৪।৫
৩। সিদ্ধির কাল নিয়ম নাই ৯
৪। চিত্ত মলিন থাকিলে সিদ্ধি হয় না ১৪
৫। সাধনার প্রথমে ত্যাগ (বৈরাগ্য) ২
৬। স্বর্গাদি কামনা ত্যাগ ১১।১২।১৩
৭। অভ্যস্ত উপাসনায় ক্রম সিদ্ধি ১৩
৮। উপাস্য দেবতার প্রাপ্তি বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি, তাহাও ত্যাজ্য (নিম্নসিদ্ধি) ১৫

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

বর্ণতত্ত্ব। (৩)

মানব জাতিকে কে সকল শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছি, তন্মধ্যে কুঞ্চিত-কেশ কৃষ্ণবর্ণগণের কথাই প্রথমে উল্লেখ করিব।

মলয়-বাসিগণ। ইহারা ইন্দো-চীন, নিগ্রিটো, এবং পূর্ব্ব-দ্রাবিড়ীয়। পূর্ব্ব দ্রাবিড়ীয় অর্থে দ্রাবিড়ীয়গণের পূর্ব্ব পুরুষ। পূর্ব্ব দ্রাবিড়ীয়গণ বলবান, সুগঠিত, অজানুলম্বিত-বাহু ও কৃষ্ণবর্ণ। নিগ্রিটোগণও তদ্রূপই। ইহারা প্রায়লম্বিত এবং শিকারী, তদুপলক্ষে দলে দলে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এক্ষণে অল্পসংখ্যক লোক কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে। গাছের ছাল ইহাদিগের পরিধেয়। সম্প্রতি কাপড় পরিতে শিখিতেছে। ইহারা অসভ্য হইলেও, ইহাদিগের মধ্যে বিবাহবন্ধন সুদৃঢ়। ইহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং ভূত প্রেত মানে। নিগ্রিটোগণ, পূর্ব্ব দ্রাবিড়ীয়গণ অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ ও কিঞ্চিৎ খর্ব্ব। ইহারা দন্তে ছিদ্র অথবা খোদাই করে। ইহারা মাটীতে কুটীর নির্ম্মাণ করে, নৌকা প্রস্তুত করিতে পারে, এবং জাল বুনিয়া মৎস্য স্বীকার করে। এতদ্দেশীয় জালীক কৈবর্ত্তগণের মধ্যে কেহ কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত ফর্সা বর্ণ দেখিয়াছেন? জালীক রমণীরা দাঁতে খোদাই করিয়া * বিষ্ণু প্রমাণ রূপা অথবা পিতল বসাইয়া দিত, এ প্রথা আমি বাল্যকালেও দেখিয়াছি। পূর্ব্ব-দ্রাবিড়ীয়গণ বালকের ন্যায় সরল কিন্তু ভাব-প্রধান এবং অভিমানী।

* ইহাকে ছুক্ কাটা বলে।

মলয়-বাসিগণ পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, এখন অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা সবল, অলস, স্বল্পেই তুষ্ট, কিন্তু কিছু মৌন-স্বভাব। ইহারা পূর্ব্বপুরুষের আচার ব্যবহারে অত্যন্ত অনুরক্ত। ইহাদিগের রাজভক্তি অধিক, এবং দেশপ্রীতিও আছে।

নিগ্রিটোগণ। মালয়বাসিগণের মধ্যে যাহারা নিগ্রিটো, তাহারা দুই চারি দিনের অধিক একস্থানে আড্ডা রাখে না, কৃষি কর্ম্ম প্রায় করে না, বলিলেই হয়। ইহারা প্রায় উলঙ্গ, বৃক্ষ ত্বক্ ও বৃক্ষপত্র দ্বারা কটির অধোভাগ সম্মুখে ও পশ্চাতে একটু আবৃত করে মাত্র। কিন্তু ইহাদিগের দাম্পত্য বন্ধন দৃঢ়, ব্যভিচার দোষ নাই বলিলে অত্যুক্ত হয় না।

দলপতির প্রভাব সর্ব্ববিষয়েই অধিক, ইনিই চিকিৎসাও করেন। ইহাদিগের দলে সকল ব্যক্তিরই সমান অধিকার। প্রতিযোগীতার মাত্রা নিতান্ত কম। অপরাধ প্রায় করে না। ইহাদিগের দলের সমস্ত সম্পত্তিই সকলের সম্পত্তি, অর্থাৎ এজমালি সম্পত্তি ভিন্ন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইহাদিগের নাই। ইহারা বিনিময়ের সাহায্যে কেনা বেচা করে।

যে বৃক্ষের তলায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার ফল ঐ সন্তান চিরদিন খাইতে পারে না। ইহারাও ভূত প্রেত এবং পরকালকে বিশ্বাস করে। তদ্ভিন্ন অন্য অনেক দেবতা মানে। ইহাদিগের মধ্যে বজ্রের দেবতার নাম পাপী,* ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং দণ্ড পুরস্কার দাতা। এই দেবতা স্ত্রী কি পুরুষ, জানা যায় না।

আণ্ডামানবাসিগণ। মানব জাতি মধ্যে ইহাদিগের একটু বিশেষত্ব আছে, প্রায় সকলের মধ্যেই শঙ্করবর্ণ দেখা যায়, কিন্তু ইহারা নিরাবিল; ইহাদিগের মধ্যে সাংকর্য্য নাই। পূর্ব্বে ইহারা সরল ও সচ্চরিত্র ছিল, বিবাহ-বন্ধনও সুদৃঢ় ছিল। এক্ষণে ক্রমে দুষ্ট হইতেছে এবং বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদিগের আকৃতি খর্ব্ব। স্ত্রী লোকেরও পুরুষের অধিকার তুল্য। ইহারা প্রফুল্ল এবং সুরসিক। ইহারা মৎস্য, কচ্ছপ, শুকর ও মধু আহার করে। ইহারা শিকারী, কৃষি কার্য্য করে না। পুরুষগণ উলঙ্গ, স্ত্রীগণ কোন মতে বৃক্ষ পত্রাদি দ্বারা লজ্জা স্থান আবৃত করে। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া স্থানে স্থানে আড্ডা করে; তীর ধনুক চালায়, কিন্তু অন্যান্য অস্ত্র কাষ্ঠে, অস্থিতে অথবা শম্বুকে নির্ম্মাণ করে। ইহারা নৌকা প্রস্তুত করিতে জানে, এবং মৃৎ-ভাণ্ড প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ইহাদিগের সমাজে একজন প্রধান থাকে, সে বুদ্ধিতে, কৌশলে, দয়া মায়ায়, যুদ্ধ বিগ্রহে এবং শিকারে সর্ব্বাপেক্ষা গুণী ও যোগ্য। ইহাদিগের বিভিন্ন দল সময় সময় মিলিত হইয়া যুক্তি পরামর্শ পূর্ব্বক কর্ম্ম করে। ইহারা একবার বিবাহিত হইলে স্ত্রী অথবা স্বামী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করে না।

ইহারা আহার বিষয়ে একটু একটু নিষেধ মানিয়া চলে, কচ্ছপ ও শুকর খায় না। পীড়া ও মৃত্যু ভূত প্রেতের কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহারা বনের সাগরের এবং বায়ুর পৃথক পৃথক ভূত কল্পনা করে। বায়ু দেবতা স্ত্রী, পুরুষ নহে। ভূতগণ কেহ কেহ ভূগর্ভেও বাস করে বলিয়া ইহাদিগের বিশ্বাস।

পাপুয়ানগণ।-ইহারা স্নেহ-প্রবণ, আনন্দময়, এবং সহজেই উত্তেজিত হয়। ইহাদিগের জীবিকা মৎস্য শিকার এবং কৃষি। কলা, নারিকেল, মিষ্ট আলু ইহাদিগের আহার।

* আমাদিগের ব্যাকরণের এবং সে পাপী।

পুরুষগণ উলঙ্গ, স্ত্রীগণ বৃক্ষপত্র পরিধান করে। ইহারা দেহে উল্‌কি পরে, এবং ঘা করিয়া ক্ষত চিহ্ন ধারণ করে। শঙ্খ, দুল, পাখীর পালক ইত্যাদি ইহাদিগের অলঙ্কার। বাঁশের খুঁটির উপর বাঁশের চাল ও ঝাঁপ দিয়া ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। তীর ধনুক সড়কী প্রভৃতি ইহাদিগের অস্ত্র। ইহারা নৌকা প্রস্তুত করিতে পারে। মৃৎভাণ্ডে রন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে, এবং কখন কখন কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রও ব্যবহার করে।

পাপুয়ানগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদিগের বিবাহ স্ব সম্প্রদায়ে হয় না, অপর সম্প্রদায়ে হইতে বর অথবা কন্যা লইতে হয়। স্ব গোত্রে বিবাহ নিষেধ করিতে পাপুয়ান্‌দিগের অপেক্ষা উন্নত জ্ঞান এবং উচ্চ সভ্যতা আবশ্যক হয় না। ইহাদিগের উত্তরাধিকারত্ব মাতা হইতে গণিত হয়, পিতাকে অবলম্বন করিয়া প্রায় ক্ষেত্রেই হয় না, তবে এক্ষণে ক্রমে হইতেছে। ইহারা বৃক্ষ, জন্তু প্রভৃতিকে আদি পুরুষ বিবেচনা করে, এবং যে সম্প্রদায় যে বৃক্ষ বা জন্তুর সন্তান, তদ্ভক্ত জনগণ তাহা আহার করে না। সাঁওতালগণের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস আছে।

প্রতি গ্রামে এক একটী এজমালী গৃহে পুরুষগণ পান ভোজন করে, নিদ্রা যায় এবং সময় ক্ষেপণ করে, স্ত্রীগণ সে গৃহ হইতে বঞ্চিত। সকলের গৃহেই এক একটী মানব মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহারা সকলে মিলিয়া একত্রে নৃত্য গীতাদি করে।

ইহাদিগের সামাজিক কর্ম্ম সকল সুযোগ্য বয়স্ক ব্যক্তিগণের সম্মিলিত মন্ত্রণানুসারে নিষ্পন্ন হয়। দলপতিগণের প্রাধান্য তাহাদিগের নিজের চরিত্রের উপর এবং তাহাদিগের দেহগত ভূতের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এইরূপ ভৌতিক আধিপত্য সকলের দেহেই আছে বলিয়া ইহারা বিশ্বাস করে। এই অশরীরী শক্তির নাম ম্যানা। প্রত্যেক গ্রামে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলপতি আছে। দুর্ব্বল দলপতিগণ একত্রে প্রবল দলপতির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করে, কখন বা অধীনতা স্বীকার করিয়া তৎসহ মিলিত হয়। স্ব সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বিবাদ বিসম্বাদ তাহাদিগের ব্যক্তিগত কার্য্য, সমাজ প্রায়ই তাহাতে হস্তক্ষেপ করে না।

ইহাদিগের বালকগণ দলের গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। বৃষ্টিপাতের জন্য, শস্য লাভের, অপত্য লাভের, অথবা স্ত্রীলাভের জন্য, পীড়া উৎপাদন অথবা মারণের জন্য ইহারা তন্ত্র মন্ত্র ব্যবহার করে। ইহারা ভূত প্রেতে বিশ্বাস করে, মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে নানাবিধ ক্রিয়া করে, এবং তাঁহাদিগের প্রেতাত্মাকে ভজনা করে। শ্রাদ্ধতর্পণাদি এইরূপ ক্রিয়া হইতে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রস্তর বিশেষের নিকট বলি ও নৈবেদ্য দেয়। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত নাই, কিন্তু যাহারা তন্ত্র মন্ত্রে দক্ষ, তাহারাই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

নিগ্রোগণ। নিগ্রিটোগণের কথা বলিতেই নিগ্রোগণের কথাও প্রকারান্তরে কতকাংশ বলা হইয়াছে। ইহারা শিকারী হইলেও প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ইহাদিগের আহার সভ্যোজনোচিত, এবং ইহারা গৃহপালিত পশু রক্ষা করে। ইহারা বৃক্ষত্বক্ এবং কার্পাস বস্ত্রও পরিধান করিয়া থাকে। অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করত কোট পেণ্টেলুন ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। ইহারা বলিষ্ঠ, সঙ্গীতপ্রিয় এবং সবল। ইহাদিগের অলঙ্কার প্রায়ই উদ্ভিদ্ নির্ম্মিত। পুরুষগণ মুসলমানগণের ন্যায় জননেন্দ্রিয়ের ত্বক ছেদ করে;

এবং অনেকে উপর পাটির কর্ত্তনদন্ত † ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহারা চতুষ্কোণ চালা ঘরে বাস করে এবং তীর, ধনুক, বল্লম, ঢাল, তরোয়াল ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের বাদ্যযন্ত্র কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ঢাক, এবং সারঙ্গের ন্যায় বহু তার-যুক্ত যন্ত্র। ইহারা বয়ন কার্য্য এবং ধাতুর গড়ন প্রস্তুত করিতে জানে, মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ এবং চর্ম্মের কার্য্যও করিয়া থাকে। ইহাদিগের বাণিজ্য ব্যবসায় নিতান্ত কম নহে।

ইহারাও স্বদলে বিবাহ করে না; বহির্ব্বিবাহই সাধারণ নিয়ম। পুরুষের বহু বিবাহ অধিক প্রচলিত, কিন্তু প্রথমা পত্নীই অগ্র-গণ্যা এবং অধিকতর সম্মানার্হা। এ প্রথা অনেক দিনের দেশের পূর্ব্ব নিয়ম স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাদিগের উত্তরাধিকারীত্ব স্ত্রী-পরম্পরায়, তবে যে স্থলে পুরুষ পরম্পরায় হয়, তথায় পুত্রগণও উত্তরাধিকার করে। চিরদাসত্ব প্রথা ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহাতে অধিক নিষ্ঠুরতা নাই। পারিবারিক দান স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারীও হইতে পারে।

ইহাদিগের সমাজে গুপ্তচর আছে, তাহারা অপরাধীদিগকে ধরাইয়া দেয়, তৎপর দলপতি দণ্ড বিধান করে।

ইহারা নানাবিধ পদার্থ পূজা করে, এবং ঐ সকল পদার্থের অনির্ব্বচনীয় শক্তি থাকা বিশ্বাস করে। ঐ সকল পদার্থের নিজের ভূত আছে, এবং অপর ভূতও তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শক্তিশালী করে। ঐ সকলের নিকট পূজা ও বলি হয়। সুখের সময় উঁহারা সমাদর এবং দুঃখের সময় উঁহারা লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হন। নিগ্রোপণ বিশ্বাস করে যে, সকল বস্তুরই নিজের চেতনা, অথবা ভৌতিক আত্মা আছে। "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম"-বাদ ঘোষণা করিতে নিগ্রোদিগের অপেক্ষা উন্নততর প্রতিভা ও সভ্যতা আবশ্যক হয় নাই। ইহাদিগের কোন কোন দেবতা স্থানীয়, অর্থাৎ গৃহদেবতা, গ্রাম্য-দেবতা ইত্যাদি। কেহবা আকাশের, কেহবা ভূমির দেবতা। ইহারাও মৃত পুরুষের উদ্দেশে ক্রিয়া করে। ইহাদিগের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহারা পুরু ওষ্ঠের ও গুরু নিতম্বের সম্মান করে। কর্ণ ও নাসিকা বেধ করতঃ উদ্ভিদ-নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে।

হটেন্‌টট্‌গণ। বলিয়াছি, ইহারা পীতবর্ণ, এবং খর্ব্বাকার। সুতরাং এ বিষয়ে ইহারা মঙ্গোলীয়গণের ন্যায়। ইহারা অস্থির-চিত্ত, অমিতব্যয়ী, বিবেচনাহীন এবং অপরিষ্কার। ইহারা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে।

হটেন্‌টট্‌গণ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কৃষিকার্য্য করে না, ফল এবং মৃত জন্তুর মাংস আহার করে। ইহারা সুরা পান করে, এবং গাঁজা খায়।

স্ত্রীপুরুষ সকলেই লোমাবৃত চর্ম্ম দ্বারা পরিধেয় প্রস্তুত করে। পুরুষেরা উহার এক খণ্ড কটিদেশ হইতে সম্মুখে ও অপর খণ্ড পৃষ্ঠদেশে পরিধান করে। পূর্ব্বে এতদ্দেশে কৃষ্ণযাত্রার গানে কৃষ্ণ যেমন সাজিত, প্রায় তদ্রূপ। সামুক এবং বাঘ-দাঁত ইহাদিগের অলঙ্কার। ইহারা পিত্তলের অলঙ্কারও ধারণ করে।

ইহারা গৃহ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তাম্বুর ন্যায় সরাইয়া লয়, অথচ এক প্রকার মাদুর দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। গৃহ-পালিত পশু রক্ষা করিতে শিখিয়াছে এবং গো-দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করে, কখন বা উষ্ট্র-পক্ষীর ডিম্বের খোলা দ্বারা পাত্রের কার্য্য করিয়া লয়। অস্ত্র তীর ধনুক।

ইহাদিগের মধ্যে অনেক দল আছে, এবং প্রত্যেক দলের দলপতি পৃথক। কিন্তু দল-পতির ক্ষমতা এ সমাজে বড় অধিক নহে।

ইহাদিগের পুরুষগণ বহু বিবাহপ্রিয়, কিন্তু স্ব-দলে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, অন্য দলে বিবাহ করিতে হয়। ধনাধিকার পিতা হইতে পুত্রে চলিয়া আসে। ইহাদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, সকলই সাধারণের এজমালী সম্পত্তি নহে।

ইহারাও তন্ত্র মন্ত্র ব্যবহার করে, ভূত প্রেত মানে। পূর্ণিমা নিশিতে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। ইহারা সুখের অধিপতি এক

† Incisors

সুখদাতা দেবতা স্বীকার করে, এবং দুঃখের অধিপতি দুঃখদাতা এক পৃথক দেবতা স্বীকার করিয়া থাকে। এই মতের সহিত জেন্দ-অবেস্তার ঐক্য আছে।

শ্রীশশধর রায়।

মায়ের কাছে আয় আবার।

আমাদিগের দেশে জলকষ্ট, অন্নকষ্ট ইত্যাদি নানা কষ্টের কথা অনাবরত শুনা যায়—ক্রমেই কষ্ট বাড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মন দিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদিগের নিজেরও কর্ত্তব্য আছে। আমরা নিজের পাপে কষ্ট পাইতেছি। যে ধর্ম্ম সমাজকে ধারণ করে, রক্ষা করে, তাহা কুসংস্কার বলিয়া আমরা ত্যাগ করিয়াছি। সুতরাং সমাজকে ধর্ম্ম ধারণ ও রক্ষা করিতেছেন না। পূর্ব্বে অশিক্ষিত লোকেও মনে করিত যে, সে পুণ্য কাজ করিবে, সে ইহলোকেই সুখী, পরলোকেও সুখী হইবে। তাই বলিয়া যাহার যেরূপ সামর্থ্য, সে সেইরূপ পুণ্য কাজ করিত। অর্থ হইলে গ্রামবাসিগণকে সুপেয় জলদান করিবার জন্য কেহ পুষ্করিণী খনন করিত, কেহ পথিকগণকে ছায়া দিবার জন্য বৃক্ষ রোপণ করিত, কেহ বা যাত্রিগণের রজনী যাপনের জন্য ধর্ম্মশালা স্থাপন করিত, কেহ বা দীন দরিদ্রকে অন্নদান করিবার জন্য অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিত। এখন লোকে সুশিক্ষিত হইয়াছে, ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, পুণ্যে আস্থা নাই, পরকালে বিশ্বাস নাই। এখন ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। এখন একটী নূতন ঈশ্বর হইয়াছে। সে ঈশ্বর নিজে ও নিজের পরিবার। আত্ম পূজা (ও নিজের পত্নী পূজা) এই একটী নূতন পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঘরে ঘরে এই পূজা। অন্যে মরে মরুক, আমি বাঁচিব, আমার পরিবার বাঁচিবে। অন্যে অসুস্থ হয় হউক, আমি ও আমার পরিবার সুস্থ থাকিব। সমাজটা একটা বৃহৎ গাভী। আমি তাহাকে দোহন করিয়া অর্থ লাভ করিব ও ভোগ করিব। এই মনে করিয়া আমরা কাজ করিতেছি। শেষে দেখিতেছি যে, সকলেই কেবল নিজের সুখ অনুসরণ করিয়া নিজের সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছি। দেশ অস্বাস্থ্যজনক হইলে কেমন করিয়া আমি সুস্থ থাকিব? নিত্য ম্যালেরিয়াতে ভুগিয়া কেমন করিয়া অর্থ ভোগ করিব? গ্রামের পুষ্করিণী সকল মজিয়া গেল। তাহা সাধারণের সামগ্রী বলিয়া আমি তাহার পঙ্কোদ্ধারের জন্য চেষ্টিত নহি। সুতরাং সুপেয় জল পাই না। গবর্ণমেণ্টকে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে দোষ দেই। খাল নদী মজিয়া যাইতেছে, মৎস্য দুর্ম্মূল্য হইতেছে। জল নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। আমরা কেবল "হা হতোহস্মি" করিতেছি। দেখিতেছি, আত্মপূজার নিমিত্ত, স্বার্থপরতার নিমিত্ত, আত্মপূজার অর্থাৎ নিজের সুখের ব্যাঘাত হইতেছে। প্রায় সকলেই আত্মপূজায় মগ্ন, স্বার্থপরতায় মগ্ন। অন্যের সুবিধা, অন্যের সুখ, অন্যের স্বার্থের জন্য আমরা ভাবি না। পরার্থপরতা বস্তুটা ঘোর মূর্খতা বিবেচনা করি। সুতরাং পদে পদে তোমার স্বার্থে আমার স্বার্থে সংঘর্ষণ হয়, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। সমাজ তাহাতে দগ্ধ হয়। তজ্জন্য মামলা বাড়িতেছে, বিদ্বেষ বাড়িতেছে, ধনী নিঃস্ব হইতেছে। যে টাকা পরার্থপরতায় নিয়োজিত হইলে কত লোকে অন্ন পাইত, সুশীতল জল পাইত, তাহা বিবাদে ব্যয় হওয়ায় সোণার সংসার ছারখার হইতেছে, দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, স্বার্থপরতা প্রবল হওয়ায় বন্ধুত্ব উঠিয়া যাইতেছে। অকৃত্রিম বন্ধুত্বের যে স্বর্গীয় আনন্দ, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। যে বন্ধুত্ব অন্যকে সুখী করিয়া সুখী হয়, তাহা দুর্লভ হইয়াছে। বন্ধু ঘোর বিপদে পড়িলেও তাহাকে অর্থদ্বারা সাহায্য করা, তাহার মঙ্গলের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা, দিন দিনই যেন ঔপন্যাসিক কল্পনা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন হ্যাণ্ডনোট ও বন্ধকী খতের রাজ্য, কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। নিজের

পরিবারের বাহিরে মায়া নাই, মমতা নাই, দয়া নাই। নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা, তাহাতে দুর্ব্বল নিষ্পেষিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, সবল জয়োল্লাসে অট্টহাস্য করিতেছে। ইহার নামই সভ্যতা, যুক্তি-পরতন্ত্রতা। এই সভ্যতায় আকাশে মনুষ্য বিহঙ্গের ন্যায় উড়িতেছে, সাগরবক্ষে বিপুল দারুনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ সম অট্টালিকা চালাইতেছে, নিমেষের মধ্যে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে। বাহ্যের ভিতর গান পূরিয়া রাখিতেছে, ইচ্ছামত তাহা ছাড়িতেছে। চমৎকার। কিন্তু অন্তরে মনুষ্য জড়ের সহিত মিশিয়া জড় হইয়া যাইতেছে। মনুষ্য জড়জগতের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, ভাবিতেছে, বিশ্ব নিজে জড়ের দাস হইয়া যাইতেছে, ভালবাসা, আধ্যাত্মিক ভাব, আনন্দ হারাইতেছে। হৃদয়ের ভিতরে সব শূন্য অনুভব করিতেছে। বাহিরে নন্দন কানন, অন্তরে মরুভূমি। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ "যেন কি নাই নাই" অনুভব করিতেছেন। হৃদয়ের প্রান্তরে যেন কোন অনাথিনী কাঁদিতেছে। মনুষ্য আবার অনুভব করিতেছে যে, জীবন গভীর,মন গভীর, জগৎতত্ত্ব গভীর। জড়পিণ্ডে তাহার অন্ত নাই। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ গভীর। তাহা ছেদন করিবার নহে। অন্যকে ছাড়িয়া প্রকৃত সুখের আশা নাই, শান্তির সম্ভাবনা নাই। আমি কেবল আমার দেহে সীমাবদ্ধ নহি। এই বিশাল মনুষ্য সমাজ আমারই বিস্তৃতি, আমারই প্রসার—বৃহত্তর, মহত্তর আমি। এই বৃহৎ"আমি"-কে সুখী না করিয়া ক্ষুদ্র "আমি"-কে সুখী করিতে পারি না। এই যে ভাব, ইহাই ধর্ম্মভাব। পরার্থরাজ্যে আত্মার এই যে অভিযান, ইহাই ধর্ম্মভাব। এই ধর্ম্মভাব এককালে বিনষ্ট হইবার নহে, বিতাড়িত হইবার নহে। অধ্যাপক রুডল্‌ফ ইউকিন (Roudolf Eucken) ইহা অন্য জগতে প্রচার করিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন, মনুষ্য আবার অনেক দেখিয়া শুনিয়া ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। Main Currents of Modern Thought, a study of spiritual and intellectual movement of the present day—এই পুস্তক লিখিয়া তিনি Nobel Prize পাইয়াছেন। ইহাতে বিবিধ বিষয় আছে। ক্রম-বিকাশ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, ইতিহাসের ধর্ম্ম, সত্যতার অর্থ, সোসিয়ালিজম্ ধর্ম্মের ধর্ম্ম ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে জড়বাদের যে তীক্ষ্ণ সমালোচনা আছে, তাহাই এখন বিশেষ আলোচ্য। ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ধর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্য সুখী হইতে পারে না। ধর্ম্ম সনাতন। ধর্ম্ম মনুষ্যের হৃদয়ের যেটা গভীর প্রদেশ, তাহা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তুমি আমি অন্ধ যদি তাহা ভাল দেখিতে না পাই, কল্য তাহা দেখিতে পাইব। ছোট ছেলে মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, ঘুরিয়া ফিরিয়া মার নিকট আইসে, তেমনি, মনুষ্য জাতি ধর্ম্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, ঘুরিয়া ফিরিয়া ধর্ম্মের ক্রোড়ে আইসে। তখন সে সুখ পায় শান্তি পায়, আনন্দ পায়। তখন মা ছেলেকে বলেন, "যারে, পুকুর কাটগে। দেশ তোর ঘর, ঘর পরিষ্কার করগে, জঙ্গল কাটগে। জলের নালা কেটে দেগে, [redacted] লোককে অন্ন দেগে"। তখন মা পরকে আপন করিতে শিখাইয়া দেন। তখন আপন আর পর ভেদই থাকে না। তখন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত চেষ্টায়, পরার্থপরতায়, সমাজের সব দুঃখ দূরে যায়, সমাজের ও সাধারণের হিতকর কার্য্য আনন্দে সংসাধিত হয়। তখন মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে শিখে। তখন সমাজ স্বর্গ রাজ্য হয়। তাই এখন মনুষ্য হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে একটা দৈববাণী উত্থিত হইতেছে—"মার কাছে আয় আবার"।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

আমার নূতন সৃষ্টি।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের লোমহর্ষণ চিত্র মনে করিলে এখনো শরীর শিহরিয়া উঠে। তখন আমরা দেবগৃহে (দেওঘরে) থাকিতাম। একদা বৈশাখ মাসের প্রত্যূষে আমি জলসায়রে স্নান করিতে যাইতেছিলাম। তখনও সূর্য্য উদিত হয় নাই, ঊষা-দেবী অদ্ধেক দ্বার খুলিয়াছেন মাত্র। কাক ডাকিতেছে, কিন্তু এখনও বাসা পরিত্যাগ করে নাই। শিবা কুল এখনো রাজ পথে বিচরণ করিতেছে, এবং দুরন্ত ছোট ছোট গাছ ও ঝোপগুলি নানা প্রকার বন্য জন্তু ও অপদেবতার মতন পরিভাত হইতেছে। আমি সম্মুখ দিকে তাকাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, আমার প্রায় বিংশতি হস্ত সম্মুখে একটা প্রেতিনী মূর্ত্তি অতি মৃদু গতিতে জল-সায়রের দিকে চলিয়াছে। তাহার কেশগুলি অনতিদীর্ঘ ও অত্যন্ত রুক্ষ। প্রভাত সমীর সঞ্চারে সে গুলি মস্তকের চারি পাশে উড়িয়া পড়ায় মাথাটাকে ভীষণ প্রকাণ্ড দেখাইতেছে। মস্তকের পরিমাণে হস্তপদ গুলি এত সরু যে দেখিলে হঠাৎ ভয় হয়। পরিধানে শতচ্ছিন্ন মলিন বসন, সে বসনে কটীর ঊর্দ্ধদেশ [redacted] জানুর নিম্নদেশ আবৃত হয় নাই। বাম স্কন্ধে একটী শিশুর মুণ্ডমাত্র দেখিলাম, দেখিয়া মনে হইল, শিশুটা মৃত। ভূত প্রেতের অস্তিত্বে আমার অবিশ্বাস, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই আমি ভূতকে কিছু ভয় করিনা, পরন্তু একটা ভূতের সঙ্গে দেখা হয়, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি দ্রুতত্তর বেগে চলিয়া প্রেতমূর্ত্তির নিকটে উপস্থিত হইলাম, একটা উৎকট দুর্গন্ধ হঠাৎ আমার নাশা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বুঝিলাম, ঐ মূর্ত্তির শরীর এবং বস্ত্র হইতেই এই দুর্গন্ধ আসিতেছে। আমি একটু বিবক্ত হইয়া দ্রুতপদে জলসায়রের দিকে চলিলাম। আমি অনেক ক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলাম, যখন ফিরিতেছি,তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ফিরিতে রাস্তায় সেই মূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। এতক্ষণে সে দুই শত হস্তও চলিতে পারে নাই, পরিশ্রান্ত হইয়া রাস্তার এক পাশে বসিয়া পড়িয়াছে। এবারে তাহাকে সম্মুখ হইতে দেখিলাম। দেখিলাম, মৃত্যুর কবলগত জীবন্ত প্রাণী। কি ভীষণ দৃশ্য। মৃত্যু, রোগে নহে, বার্দ্ধক্যে নহে, অনশনে। লক্ষণ দেখিয়া অনুমান হয়, অভাগিনী যুবতী, কিন্তু তাহার যৌবন চিহ্ন কিছুই নাই,অস্থিসার কঙ্কালের উপরে লোমিত চর্ম্ম-চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট,সে চক্ষে তেজ নাই, তাহাতে জল নাই। সে চক্ষু বলিতেছে, জগতে তাহার কিছু আশা নাই, কিছু প্রার্থনীয়ও নাই। বক্ষস্থল শুষ্ক, মাতৃচিহ্ন অস্থির সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে। জানিলাম, ঐ শুষ্ক বক্ষ চুষিতে চুষিতে এক বৎসরের শিশু অনাহারে মায়ের বুকের উপর প্রাণত্যাগ করিয়াছে। উত্থান-শক্তিহীনা অভাগিনী মৃত শিশুকে বুকে জড়াইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল। পুলিশ আসিয়া তাহাকে তাড়না করিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষে মানুষ মরিয়াছে, পাছে একথা প্রকাশ পায়, এইজন্য সরকার যাহাতে শিশুটা শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হয়, সরকারী লোকের তজ্জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা জন্মিল। পুলিসের উৎপীড়নে অভাগিনী মৃত শিশু কাঁদে লইয়া তাহাকে কোথায় ফেলিবে, তাই চলিয়াছে। অহা। সে কি আর চলিতে পারে? খুঁটী খুঁটী চলিয়াছিল,এখন বসিয়া পড়িয়াছে। এমন সময় কয়েক জন লোক, আকৃতি ষণ্ডামার্কের ন্যায়, প্রাতঃস্নান করিতে সেই পথে জলসায়রে যাইতেছিল। তাহারা রাস্তায় শব দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইল, এবং অতিকর্কশ স্বরে বলিল, "হ্যাঁড়ে, তুই কোথাকার লক্ষ্মীছাড়া হতভাগিনী, মেয়াটা লইয়া এ দিকে কোথায় যাইতেছিস্? ঐ দিকে শিবগঙ্গায় যা, এখানে কি মরা ফেলবার জায়গা?" পাঠক,আপনাকে এ কাহিনী আর শুনাইব না, ইহার পরে কি হইল, জানিতে আপনার কুতূহল জন্মিতে পারে, কিন্তু আমি আপনার সে কুতূহল নিবারণ করিব না। আপনি এই দুঃখিনীর অবস্থাটী একবার হৃদয় মধ্যে চিন্তা করুন

এমন দুর্দ্দিনে তাহার "আহা" বলিবার কেহ নাই, তাহার উপর আবার গালাগালি। তখন আমার মনে হইল, পৃথিবীটা যেন হৃদয়হীন হইয়া গিয়াছে, আরও মনে হইল "দয়াময় তুমি কোথায়? নরলোকে কি তোমার দয়াময় নাম ব্যর্থ হইল?"

সমস্ত দিন মনটা ক্লেশ ভাবে অবসন্ন হইয়াছিল। রাত্রে সেই ক্লেশ, সেই চিন্তা মাথায় লইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। নিদ্রিতাবস্থায় একটী অচিন্তিত-পূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, জগজ্জীবের ক্লেশ নিবারণ জন্য আমি কোন বিজন গিরিকন্দরে অতি উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবানের নিকট এমন বর ভিক্ষা করিয়া লইব, যাহাতে জগতে আর দুঃখী কেহ থাকিবে না। এই অসামঞ্জস্য-পূর্ণ সংসারে পূর্ণসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পৃথিবীর দুঃখ ও হাহাকার ষোল আনা না থাকিলেও অনেক আশা কমিয়া যাইবে। আমার ব্যাকুল ও সরল প্রার্থনায় দেবতা প্রসন্ন হইলেন এবং বরদায়িনীরূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া "বৎস! বর বৃণু" এই মধুর রবে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিলেন। আমি অনেক প্রকার স্তবস্তুতি করিয়া বলিলাম "দয়াময়ি, তুমি জগন্মাতা, যাহাতে জগতের দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচিয়া সংসার সুখের সংসার হয়, তুমি জগতের প্রতি এইরূপ বর প্রদান কর।" দেবী বলিলেন, "বৎস, জীবের প্রতি তোমার দয়া দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে আমি এমন শক্তি প্রদান করিতেছি, যাহাতে তুমি তোমার ইচ্ছা মত জগতের শৃঙ্খলা বিধান করিতে পারিবে।" বর প্রদান করিয়াই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন, আমি চক্ষু বুজিয়াই চক্ষু চাহিয়াছিলাম, দেবীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণকালের জন্য সমস্ত বিশ্ব অন্ধকারময় দেখিলাম। যে বর পাইয়াছি, সংসারে কাহারও কিছু আর অভাব রাখিব না, এই স্থির করিয়া আমি নূতন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশ্চর্য্য এই যে, আমার ইচ্ছা মাত্র পৃথিবী ভাঙ্গিতে গড়িতে কিছু মাত্র বিলম্ব হইতেছিল না। আমি জগতের যত সমস্ত জীর্ণ গৃহ ও পর্ণকুটীর এক মুহূর্ত্তে কোথায় উড়াইয়া দিলাম। সমসূত্রে কাতারে কাতারে মনোহর হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মিত করিলাম। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে একই রকম আসবাব রাখিলাম। সকলের আঙ্গিনায় এক এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রার এক একটী তোড়া রাখিয়া দিলাম। দুঃখিনীদিগের রুক্ষকেশে ঢালিবার জন্য রাশি রাশি কুন্তলবৃন্ত, কুন্তলীন ও জবাকুসুম রাখিলাম। এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া মনে যে আনন্দ হইল, তাহা বচনে ব্যক্ত করা যায় না। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে সেই রাত্রেই একবার রাত্রি প্রভাত হইল। তখন আমি সকাল বেলায় উঠিয়া মুখ ধোয়ার জলের জন্য ভৃত্য লালুয়াকে ডাকিলাম। অন্য দিন আমার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বেই লালুয়া আমার প্রাতঃকৃত্যের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রাখে। আজ দেখিলাম, কিছুই নাই। অনেক বার ডাকিলাম, তবু তাহার সাড়া শব্দ পাইলাম না। রামন ঠাকুরকে ডাকিলাম, সাড়া পাইলাম না। তখন বড়ই রাগ হইল, কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তিদিগের উপর রাগ করা বৃথা ভাবিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। শরীর-ধর্ম্ম ত আর সবুর মানে না, কাজেই জল পাত্রটী লইয়া ইন্দারার নিকট উপস্থিত হইলাম। সুগভীর কূপ হইতে বালতী পূরিয়া জল তোলার অভ্যাস নাই, কিন্তু নাচার হইয়া করিতে হইল। কোন প্রকারে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া রাস্তায় পায়চারি করিতে বাহির হইলাম। এমন সময় দেখি, লালুয়া অতিশয় গজেন্দ্রগমনে লম্বা কোচা ঝুলাইয়া নবাবী গতিতে সেই রাস্তায় কাহাকে খুঁজিতেছে। আমি তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম, সে শুনিয়াও আমার নিকট আসিল না, তখন আমি কিছু বিরক্ত হইয়া, এমন কি চটিয়া, তাহার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "কিরে লালু, তুই কি নবাব হইয়াছিস্? আমার কথা শুনিতে পাস না? এখানে ঘুরিতেছিস্ কেন?" লালুয়া কিছু মাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল "মহাশয়, আমার একটা চাকর অভাবে বড়ই অসুবিধা হইয়াছে, বিশেষতঃ পাখা টানিবার লোক না থাকায়

কাল সারা রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই, তাই একটা লোক অন্বেষণ করিতেছি। আমি বলিলাম "সেকি রে? তোর আবার চাকরের দরকার? তবে আমাদের কাজ কি রূপে চলিবে?" লালুয়া অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিল "মহাশয়, ভরসা করি, আমার সঙ্গে কিছু ভদ্র ভাবে কথা কহিবেন। আমিও একজন সম্ভ্রান্ত লোক, ভগবানের কৃপায় আমার ত্রিতল বাটী ও লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার সংস্থান আছে। অভাবে পড়িয়া এক সময় আপনার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলাম, এখন আর আমার সেদিন নাই। আমিও দশজন চাকর রাখিতে পারি এবং চাকরের অন্বেষণেই বাহির হইয়াছি।" লালুয়ার কথা শুনিয়া আমি আমার স্বকৃতকার্য্য-ফল বুঝিতে পারিলাম এবং আমার নূতন সৃষ্টিতে কোথায় কিরূপ সংসার কার্য্য চলিতেছে, দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। দেখিলাম, মনোহর সৌধরাজিতে জনপদ স্বর্গশ্রী ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক ভবনে একটা করিয়া সুদীর্ঘ সরোবর, সরোবরের জল আকাশের ন্যায় নীলাভ ও নির্ম্মল, তাহাতে অসংখ্য রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া মৃদুমন্দ সমীর হিল্লোলে দুলিতেছে। দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। নিজের কীর্ত্তি দর্শনে গৌরবান্বিত হইয়া আমি পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু একি? এমন সুখের সংসারে দুঃখের কোলাহল উঠিয়াছে কেন? প্রত্যেক গৃহ হইতে বালক বালিকাগণের করুণ রোদনধ্বনি উত্থিত হইতেছে, অনুসন্ধানে জানিলাম, প্রভাতে গোয়ালারা দুগ্ধ জোগায় নাই, শিশুগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে, জনক জননী অনন্যোপায় হইয়া পথ পানে চাহিয়া আছে। হায়, বুঝিতে পারিতেছে না, আজ কে দুধ জোগাইবে? গোয়ালারা যে ত্রিতল বাটীতে বসিয়া লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার শোভা দেখিতেছে। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই আমার নূতন সৃষ্টিতে হাহাকারও বাড়িতে লাগিল। হাটে হাট মিলে নাই, বাজারে দোকান পাট বন্ধ, ক্রেতা আছে বিক্রেতা নাই, সকলেই স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া ছুটাছুটী করিতেছে কিন্তু কোথাও কোন জিনিষ পাইতেছে না, এদিকে ছাপাখানাগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কম্পোজিটার কি প্রেসম্যান পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়গুলিও বন্ধ, কারণ শিক্ষকগণ আর সামান্য অর্থের জন্য মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নন, তাঁহাদের সকলেরই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আছে। সমুদ্রে বাণিজ্য-জাহাজ চলে না, রাস্তায় গাড়ী চলেনা, জীবন্ত জগৎটার একেবারে অবসন্ন ভাব উপস্থিত হইয়াছে। শিল্প, বাণিজ্য, জ্ঞান বিজ্ঞান সমস্তই যে লোপ হইতে চলিল, একি! কি ভয়ানক ব্যাপার। ডাকাতি! কি ভয়ানক লুট। কি নির্ম্মম ডাকাতি উপস্থিত হইল। যে গৃহে বা যে দোকানে যৎ কিঞ্চিৎ শস্য আছে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বলিষ্ঠ লোকেরা সে সমস্ত লুট করিল। কি বিষম মারামারি কাটাকাটি উপস্থিত। রক্ত! রক্ত! নররক্তে ধরা কর্দ্দমময় হইয়া গেল। আহা, আমি কি করিলাম, সাম্য স্থাপন করিতে যাইয়া বসুন্ধরা ছারখার করিলাম। সুখের জন্য ঘর করিয়া তাহাতে দুঃখের আগুন জ্বালাইয়া দিলাম। জনসমাজের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া তাহাকে সুখশূন্য, জ্ঞানশূন্য, অভ্যাসশূন্য করিয়া ফেলিলাম। যাহাদের শরীরে শক্তি ছিল, তাহারা লুট তরাজ করিয়া কিছুদিন উদর পোষণ করিল, যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা সবলের পদাঘাতে এবং অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। যাহারা বাঁচিল, তাহারা অখাদ্য মাংস, পচা ঘাস পাতা খাইয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিল, আবার সেই আদিম কালের ন্যায় নরনারী সকলেই পশুহননে প্রবৃত্ত হইল, সকলেই হলচালনা করিতে বাধ্য হইল। আমার নির্ম্মিত বাড়ীগুলির ক্রমে জীর্ণাবস্থা উপস্থিত হইল, রাজমিস্ত্রী ও মজুর নাই, সুতরাং সে গুলির আর মেরামত হইল না, ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূমিসাৎ হইল, তখন বৃক্ষকোটর, পর্ণকুটীর ও ভূগর্ত্ত সকলের বাসস্থান হইল। সহস্র সহস্র বৎসরের বিকাশ অল্পদিনের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য যে, আমার অবস্থাও সকলের সমতুল্য হইয়াছে। আমি একটী মৃত্তিকাগর্ত্তে বাস করিতেছি, কটিদেশে বল্কল ও ঘাস জড়াইয়া লজ্জা রক্ষা করিতেছি, পশুহননই আমার উপজীবিকা। কোথায় চাকর বামন, কোথায় পাখাওয়ালা, কোথায় গাড়ীঘোড়া,

কোথায় বা আফিস কলেজ, কোথায় গ্রন্থরচনা, কোথায় প্রবন্ধ পাঠ, খবরের কাগজ, কোথায় গেল বৈদ্যুতিক আলো, কোথায়ইবা বেল ষ্টিমার, অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ব্বজীবন স্বপ্নবৎ হইয়াছে। জগতে যে সে সমস্ত ছিল, তাহা এখন স্মৃতিবলে টানিয়া আনিলে জন্মান্তরীন অস্ফুট ভাবের ন্যায় অনুভব হয়। এই অবস্থায় একদিন শূল হস্তে খাদ্য জীবের অন্বেষণে একটা ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড সিংহ লম্ফ দিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং কেশর ফুলাইয়া, লেজ নাড়িয়া, নখে মাটী খুঁড়িয়া আরক্ত চক্ষে আমার দিকে তাকাইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি ভয়ে দিশাহারা হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সেই ক্রন্দনধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করায় আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জাগ্রত হইয়া দূরাগত বাষ্পীয় শকটের গম্ভীর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম, আমি আমার নিজগৃহে বিশিষ্ট শয্যায় পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া আছি এবং আমার পুত্র কন্যাগণ আশে পাশে শয়ন রহিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিল, স্বপ্ন ছুটিল, আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। স্বপ্নের মধ্যে কয়েক বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। এই কয়েক বৎসরের নানা প্রকার ক্লেশে শরীর দুর্ব্বল এবং মন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। স্বপ্নটা এতই হৃদয় অধিকার করিয়াছিল যে, আমি জাগ্রত হইয়া সহসা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না যে, ভূত ও বর্ত্তমানের কোনটা স্বপ্নাবস্থা।

রাত্রি প্রভাত হইল, সমস্ত পরিজন জাগ্রত হইল, দাসদাসীগণ আপনাপন কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যস্ত হইল, আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সভয় হৃদয়ে রজনীর স্বপ্নটীর মনে মনে পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আমার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া লালুয়া পাখা হাতে আমাকে বাতাস করিতেছে। তখন আমার মনে অনেক চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, জগতে ধনী বড়,কি গরীব বড় ? মানব জাতির সুখ সৌভাগ্য, জ্ঞান সভ্যতা, দর্শন বিজ্ঞান, সমস্তের ভিত্তিইত গরীবের অশ্রুবিন্দু এবং রক্ত বিন্দুর উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি, মনুষ্যের হৃদয়-রাজ্যের উৎকর্ষতা বিধান জন্যও গরীবের একান্ত প্রয়োজন, সুতরাং গরীব ধর্ম্মকর্ম্মেরও সহায়। গরীব না থাকিলে ধনীরা যে কতদূর বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা ত স্বপ্নেই দেখিয়াছি। হায়, আমরা কি অকৃতজ্ঞ! অতি সামান্য দানে গরীবদিগের নিকট হইতে যে মহামূল্য প্রতিদান পাই,তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আমরা না হইলে তাহাদের দিন চলে, কিন্তু তাহারা না হইলে যে আমাদের দিন চলে না। ম্যাথরাণী চাকরাণী আছে বলিয়াইত তুমি রাজরাণী হইতে পারিয়াছ,নতুবা যে তোমাকেই ম্যাথরাণী চাকরাণী হইতে হইত। ধনী উপকৃত, গরীব উপকারী, তবে গরীবের কাছে ধনীর কিসের বড়াই ? মনে মনে গরীবকে নমস্কার করিলাম। আর আমার হাতে সৃষ্টিশক্তি থাকিলে জগতের যে কি গতি হইত, তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম, বিধাতা সৃষ্টিকার্য্যে ভুল করেন নাই, সমাজ সংস্থানে দরিদ্র ও দরিদ্রতার প্রয়োজন আছে। তবে কি মানুষ দরিদ্রতা নিবারণে যত্ন করিবে না ? তবে কি দুঃখীর চক্ষের জল মুছাইতে হাত বাড়াইলে বিধাতার বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করা হইবে ? না, তাহা নহে। অভাব হইতে উন্নতি, এবং উন্নতি হইতে অভাব মোচনের চেষ্টা চক্রাকারে ঘুরিয়া জগৎ-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। বীজকে বিনষ্ট করিয়া অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেই অঙ্কুর হইতে আবার বীজ উৎপন্ন হয়, এই বিধানেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে। দরিদ্র হইতে ধনীর সুখ, ধনীর দ্বারা দরিদ্রের দুঃখ মোচনের চেষ্টা, ইহাই জগতের স্থিতি ও উন্নতির মূল। যে ব্যক্তি দরিদ্রকে দরিদ্র ভাবিয়া তুচ্ছ করে, অথবা নিরাশ্রয় দরিদ্রকে উৎপীড়ন করে, সে কেবল অকৃতজ্ঞ নহে, সে ব্যক্তি দেবতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হয়, কারণ বিধাতা তাহার হৃদয়-রাজ্য সুঠাম করিবার জন্য যে উপাদান দিয়াছেন,তাহা সে অবহেলায় পদদলিত করিল। এই সমস্ত ভাবিতেছি, এমন সময় জানালার ফাঁক দিয়া সূর্য্যালোক আসিয়া আমার মুখের উপর পড়িল, অনেক বেলা হইয়াছে ভাবিয়া গাত্রোত্থান করিলাম এবং আমার নূতন সৃষ্টির কথা ভাবিয়া সলজ্জ ভাবে বিশ্বস্রষ্টাকে প্রণিপাত করিলাম। শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি।

বিলাস-ভবন ফেলি' হিমাদ্রির শুভ্র চূড়া পরে,
ধ্যানলীন যাপিতেছ মহানন্দে দিবস শর্ব্বরী,
জুসাড় শরীর সর্ব্ব রোমাঞ্চ কঠিন কলেবরে
তুষার গড়ুয়ে গেছে শুভ্র তাই উৎসঙ্গ উপরি,
হেসেছে উষার আলো কেশরাশি ও পলিত ললাটে—
তখন যেদিন ধ্যানে তারপর সারা দিনমান
কেমনে কাটিয়া গেছে, দিনমণি অস্তাচল পাটে—
মুহূর্ত্তে মেলিয়া আঁখি, আবার মুদেছ দুনয়ান।
সন্ধ্যারাণী নামিয়াছে, হাসিয়াছে পূর্ণিমার শশী,
ধ্যানমগ্ন হে মহর্ষি, হেরি তব তপস্যা কঠোর
ঝর্ ঝর্ মুখশোভা, বলিহারি আত্মার আবনী
নিম্ন উপত্যকা রহে ধ্যান হেরি বিস্ময় বিভোর।
হে অদম্য পান্থ, আজি, তোমার সে প্রথা'পর দিনে
সুদুর্গম পথ, বল, কতদূর চলিয়াছ চিনে

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুগবিপ্লব।

বার বৎসরে এক যুগ, প্রতি যুগাবসানে খণ্ড প্রলয় ইহা শাস্ত্রের উক্তি। যিনি অন্ততঃ বার বৎসরের খবর দিতে পারেন, তাঁহাকে এই উক্তির সারবত্তা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে, সামাজিক রীতিনীতির গুণে, বাণিজ্য ব্যবসায়ের গুণে, স্বদেশ বিদেশের আদান প্রদানের ফলে এবং সঙ্গ ও আদর্শের ফলে আমাদের মতি, গতি, ভাবচিন্তা, বাক্য ও ব্যবহার বদলাইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন এত দ্রুতগতিতে হইতেছে যে তাহা প্রতিবার বৎসরে বিপ্লব বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বিপ্লব আসিবেই, তুমি আমি তাহার গতিরোধ করিতে পারিব না। ঝড়ের বাতাসের ন্যায়, বন্যার জলের ন্যায় সে দেশ প্লাবিত করিবেই। আমাদের প্রবৃত্তি সে বিপ্লবে কূলার বাতাস দিয়া, আমরা এক চরণ অগ্রসর হইলে, আমাদিগকে আরও দশ চরণ ঠেলিয়া দেয়। নিবৃত্তির ক্ষীণস্বর ও হিতবাক্য প্রবৃত্তির প্রবল তুফানে মুহূর্ত্তে উড়িয়া যায়। অতএব প্রতি বিপ্লবে নিম্ন গতির যত অধিক পরিচয় পাইতে পারি, তত উদ্ধগতি প্রত্যাশা করা যায় না। এইহেতু, আমাদের অস্তিত্ব, সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের চরিত্রে বিধাতা বিপ্লবের প্রতিকূলশক্তি বা সংরক্ষণশীলতা সৃষ্টি করিয়াছেন। পরিবর্ত্তনের প্রতিপক্ষে সংরক্ষণের ভার চাপাইয়া প্রকৃতির সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইতেছে। কিন্তু বিকৃত বিপ্লব যেমন আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে, অধোগতির দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, বিকৃত সংরক্ষণও সেইরূপ আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায়,সুতরাং সর্ব্বনাশের কারণ।

গত অর্দ্ধশতাব্দীতে আমাদের দেশে যুগের পর যুগ চক্রনেমির ন্যায় ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহাতে সংস্কার ও সংরক্ষণের যে ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখা গিয়াছিল, সেও এক মহা বিপ্লব। আমাদিগের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি যে সকল বিপ্লবতরঙ্গে আলোড়িত হইয়াছে, তাহাদের সমবেত শক্তির ফলে আমরা অগ্রসর হইতেছি, কি পশ্চাৎ সরিয়া যাইতেছি, তাহার হিসাব নিকাশের সময় আসিয়াছে।

পাশ্চাত্য ইয়োরোপীয় জাতিরা যখন আমাদের দেশে আসিয়াছিল, তখন আমরা তাহাদের নিকট কোন কিছু শিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম, এমন কথা ইতিহাস বলিতে পারে না। তখন তাহারাই আমাদের ভাষা শিখিত, আমাদের পান তামাক হুকা কলকে তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিত, আমাদের নগ্ন দেহ ও শিথিল বেশ তাহাদের অনুকরণের বিষয় হইত। কিন্তু nothing succeeds like success. যখন ইংরাজ বণিকের তুলাদণ্ড রাজদণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, যখন গোরায়

কালায় সংঘর্ষে আমরা গোরার শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম, যখন ইংরাজের বাহুবলে, বুদ্ধিবলে ও কৌশল জালে, লক্ষ্ণৌ ও মুরশিদাবাদের 'বাইনাচের' নবাবগিরি ও মহারাষ্ট্রের দস্যুপনা তাসের ঘর ও ভোজের বাজির ন্যায় চক্ষের নিমেষে উড়িয়া গিয়াছিল, তখন আমরা বুঝিয়াছিলাম, পাশ্চাত্য জাতির পশ্চাতে এক মহাশক্তির অস্তিত্ব লুক্কায়িত আছে। ইহারা তাহারই প্রভাবে বিদেশে এতদূরে আসিয়াও জয়যুক্ত ও গৌরবান্বিত হইতেছে। তখন আমাদের হিন্দুসমাজের মধ্যশ্রেণীর যে সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য এত কাল তুরি দিয়া রাজশক্তিকে নাচাইতেছিলেন এবং নাসিকায় রজ্জু দিয়া প্রজাসাধারণকে চালাইতেছিলেন, তাঁহারা চৈতন্য লাভ করিয়া ইংরাজ রাজশক্তির মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ ভাবিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মই বুঝি ইংরাজের উন্নতির সোপান। কেহ মনে করিলেন, সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও যথেচ্ছাচারিতাই বুঝি তাহাদের শক্তির উৎস। কেহ সিদ্ধান্ত করিলেন,তাহাদের ভাষাবৈভব ও তাহাদের শিক্ষাপ্রণালীই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধির মূল। সুতরাং বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। রাষ্ট্রবিপ্লব অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশে ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল। যিশুর ধর্ম্ম, ইংরাজী শিক্ষা, মদ্য মাংস ভক্ষণ, জাতিভেদবর্জ্জন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আমাদের মধ্যশ্রেণীর লোকেরা গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইলেন। সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পথে ঘাটে বিতর্ক হইতে লাগিল। সমাজ কুম্ভকর্ণ জৃম্ভন করিতে লাগিলেন।

রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, কালীচরণ ও কেশবচন্দ্র সেই বিপ্লবযুগের ফল। অল্প দিনেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল, নীতিহীন সংস্কার জীবন নহে মরণ, আত্মরক্ষা নহে আত্মনাশ। এই জন্য প্রকৃতি সাবধান হইয়া আপনি বাঁচাইয়া নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। উচ্ছৃঙ্খলতার গতিরোধ করিতে খ্রীষ্টধর্ম্ম দণ্ডায়মান হইয়াছিল, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সমাজ বিপ্লবের গতিরোধ করিতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপ্লববাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সার্জ্জিত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। এই ত্রিবিধ শক্তিই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ দ্বারা, ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা এবং নীতি ও সাধুদৃষ্টান্ত দ্বারা পরস্পরকে আপন আপন কক্ষে স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। সংস্কারই বলি, সংরক্ষণই বলি, আর স্থিতিশীলতাই বলি, সকলেরই উদ্দেশ্য এক—ধ্বংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা। সংরক্ষণ যদি আমাদিগের জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া মরণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়,তবে তাহা পরধর্ম্ম ভয়াবহ,তাহাই পরিহার্য্য। পক্ষান্তরে সংস্কার যদি আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া আমাদিগকে বিপথে সর্ব্বনাশের দিকে লইয়া যায়, তাহা হইলে পশ্চাৎ হইতে সংরক্ষণের রজ্জুদ্বারা তাহার গতিরোধ করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত প্রকার প্রাকৃতিক প্রেরণার বশে অতীত যুগবিপ্লবে একদিকে যেমন শিক্ষিত উচ্চবংশীয় হিন্দুগণ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সাধুদৃষ্টান্ত দ্বারা স্বজাতীয়দিগকে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে আহ্বান করিতেছিলেন, অপর দিকে শশধর, কৃষ্ণপ্রসন্ন,কালীবর প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ পুরাতন শাস্ত্রতত্ত্ব নূতন ভাবে ও নূতন ব্যাখ্যায় সাজাইয়া হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মধ্যস্থলে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ বীরের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিতেছিলেন, "হে জগদ্বাসি, তোমরা যদি মঙ্গল চাও, পৃথিবীতে যদি প্রতিষ্ঠার সহিত বাঁচিয়া থাকিতে চাও, আমাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কর। নতুবা 'বামণ বারুণের বা' ধ্বংস অনিবার্য্য।" তখন শিক্ষিত জনসাধারণ খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও সংস্কারক, পুনরুত্থানবাদী হিন্দুদিগের নিকট হইতে নীতি ও ধর্ম্মের সত্য গ্রহণ করিয়া উচ্চাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিয়া জীবনসমস্যা মীমংসা করিতে সমর্থ হইতেন।

কিন্তু এখন সত্যপ্রচারের ও সত্য নির্ণয়ের মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া যে সংস্কারক বা সংরক্ষক অপর পক্ষকে আক্রমণ করা,তাহার অনুষ্ঠিত চেষ্টাকে শ্লেষ করা বা মতান্তরের বিদ্রূপ করাকেই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহারা স্বয়ং মৃত্যুর পথে

যাইতেছেন এবং অপরের সর্ব্বনাশের জন্য রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিতেছেন। নীতি ও সত্যরক্ষা করা কঠিন ও অপ্রিয়কর। কিন্তু স্রোতে শরীর ঢালিয়া দিয়া জড়তা ও শিথিলতার আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া বাঙ্গ বিদ্রূপ করা অতি সহজ ও আরামজনক। পশ্চিমে আর্য্য সমাজের সহিত এবং বঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সংগ্রাম করিতে যে সকল শঙ্কর, কুমারিল ও রামানুজ পুনরায় আমাদের দেশে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদের উন্নত আদর্শের স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া হিন্দু সাধারণ ধরিয়া রাখিয়াছেন কেবল দ্বন্দ্ব, বড়াই, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি অযথা আক্রমণ, শ্লেষ ও বিদ্রূপ। পরিতাপের বিষয়, আমরা আরও শিখিয়াছি চিন্তাহীনতা, গড্ডলিকা প্রবাহ, বিলাস পরতন্ত্রতা ও দলাদলি। এই দলাদলি ও বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিণাম এই হইয়াছে যে, আমরা জীবন মরণ সমস্যা ভুলিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতি ও আত্ম রক্ষার প্রশ্ন অবহেলা করিয়া মরাকলে বিপরীত বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইতেছি। খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মগণ যাহা বলিবেন ও করিবেন, স্ত্রী আমাদের সিদ্ধান্ত তাহাই মন্দ ও বর্জ্জনীয়। তাঁহারা যদি বলেন, মূর্ত্তিপূজা অনিষ্টকর, আমাদিগের আর ভাবিবার চিন্তিবার প্রয়োজন নাই, বলিতেই হইবে, মূর্ত্তিপূজা ইষ্টকর। তাহারা যদি বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, আমরা ঈশ্বরের সাকার রূপ, আর নাই রূপি, টিকটিকি দিয়া বলিব ঈশ্বর সাকার। তাঁহারা যদি বলেন, বাল্যবিবাহ মন্দ, আমরা বলিব, উহা পরিবর্ত্তনকর। তাঁহারা যদি বলেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল, আমরা বলিব স্ত্রীশিক্ষা ভয়ঙ্কর অনিষ্টকারী। তাঁহারা যদি বলেন, পতিতা স্ত্রীলোকের সংস্রবে আসিও না, আমরা জিদ করিয়া বলিব, তাও কি হয়, তাহাদের বাড়ীর মাটী যে ভগবতীর পূজার লাগে। তাঁহারা যদি বলেন, থিয়েটারে যাইতে নাই, আমরা তাহাদিগকে দেখাইয়া দেখাইয়া থিয়েটারে যাইব, নাচ দেখিয়া বাহবা ও আঁকোর দিব, আর কুলের তে ড, ছুরিয়া মারিব। তাঁহারা যদি বলেন, ছেলে মানুষের সিগারেট খাইতে নাই, আমরা বলিব, আহা সোণামাদু, স্বদেশী বিড়ীতে একটা টান দেও, বেঙ্গলেখানী হয়ে অধঃপাতে যেওনা।' স্থূলকথা নিজের হিতাহিত না বুঝিয়া আমরা কেবল বিরুদ্ধবাদ ও পরের যুক্তি খণ্ডন করিতে শিখিতেছি। আমরা বিতণ্ডাবুদ্ধিবিশিষ্ট তার্কিকের জাতি নহি, তর্কবুদ্ধিবিশিষ্ট উকীলের জাতিতে পরিণত হইতেছি।

এই করিয়া আমরা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছি। বিধাতা ভিন্ন আমাদিগকে রক্ষা করিবে কে? বর্ত্তমান যুগবিপ্লবে ইহাই আমাদের সমাজের সান্নিপাতিকের লক্ষণ। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রামকৃষ্ণ থিয়েটারে গিয়াছিলেন বলিয়া কি আমাদিগকেও থিয়েটারে যাইতে হইবে? সমান অবস্থায় রামকৃষ্ণকে চরিত্রহীন পুরুষ রমণী স্পর্শ করিলে তাঁহার শরীর অশুদ্ধ হইত। আমাদেরও তাহাই হয় কি? বিলাতে পতিতানারীর সংস্পর্শশূন্য থিয়েটার amusement হইতে পারে, আমাদের দেশেও কি বিলাতের অনুকরণে থিয়েটার ও বলনাচ গৃহে গৃহে প্রচলিত করিতে হইবে? আমাদের অত্যন্ত উন্নতিতে যবনিকা পতনের পূর্ব্বকালে এদেশেও নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন কি আমাদের দেশে মালবিকার ন্যায় অভিনেত্রী ও সূত্রধারের ন্যায় অভিনেতা আছে যে, পূর্ব্বকার সেই বিলাসপথে মৃত্যুর জীবন পুনরায় এদেশে জাগাইয়া তুলিতে পারিব? রঙ্গরস ও থিয়েটারের চৈতন্যলীলা ভক্তির উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক। উহার সুফল অত্যন্ত শুভজনক নহে। বিশেষতঃ যে থিয়েটারে পতিতা রমণীর লীলা অভিনয়, ও নৃত্যগীত হয়, সেখানে বালক যুবক ও ভদ্রমহিলার গমন কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

সেদিন বেঙ্গলী কাগজে দেখিলাম, (১) ফরিদপুরের কৃষি প্রদর্শনী মেলায় এবার রূপের হাট বসিবে, সৌন্দর্য্য ও যৌবনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে, পিতৃ-পুত্র-ভ্রাতা-জামাতা, কনিষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠতাত বারঙ্গনে এক সঙ্গে বসিয়া বারবনিতার নৃত্যসঙ্গীত উপভোগ করিবেন এবং রমণীর অধর-সুধা-বিনিঃসৃত বাক্য-সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইবেন। বর্ত্তমান-যুগ

(১) ১০ই জানুয়ারি।

বিপ্লবের নৈতিক জীবনের শিথিলতার ও জাতীয় জীবনের অকাল বার্দ্ধক্যের ইহা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সত্য মিথ্যা জানিনা, শুনিলাম কেহ কেহ প্রকাশ্য সভায় বেশ্যানাটোর সমর্থন করিতে যাইয়া নির্লজ্জের ন্যায় বলিয়াছিলেন, থিয়েটারের শিক্ষায় তাঁহার এবং তাঁহার পুত্র-কন্যাও গৃহিণীদিগের শনৈঃ শনৈঃ নৈতিক উন্নতি হইতেছে। "বপেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" এইবার পুরুষোত্তমের মাহাত্ম্য যায় যায়, উড়িষ্যার পাণ্ডাগণ সাবধান হউন। অনেক দিন হইল, অম্বিকাবাবু জুবিলি ট্যাক্সের প্রস্তাব করিলে কোন কোন স্বদেশহিতৈষী প্রতিবাদ করিয়া টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের পক্ষে মত দিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে,স্কুল না হইয়া পুকুর হইলে অন্নাভাবে বিপন্ন হইয়া যুবকগণের ডুবিয়া মরিবার পথ হইবে (২)। কৃষি ও শিক্ষা প্রদর্শনী থিয়েটারে পরিণত হইতেছে, এখন তাঁহারা কোথায়?

ফরিদপুর আমাদের জন্মভূমি। তাহার মাটী, তাহার জল, তাহার বাতাস, তাহার খাদ্য আমাদিগকে গড়িয়াছে। সেই দেশের ভাষার সম্পদ, উপকথার শিক্ষা, সমাজ শাসন ও ধর্ম্ম গাঁথা আমাদের জীবনের স্তরে স্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে অশোকের শিপালিপির ন্যায় চিরাঙ্কিত রহিয়াছে। সেই কৃষিপ্রধান দেশে স্বদেশীর পিতামহেরও জন্মের বহু পূর্ব্বে ভারতের অঞ্চলের নিধি পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসু কৃষিকার্য্যের উৎসাহ প্রদানের জন্য বার্ষিক শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর বুনিয়াদ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সংস্পর্শে যে ক্রিয়াশীলতা আমাদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা তাহারই বিকাশ মাত্র। এবার শুনিতেছি, সেই মেলার আমোদ আহ্লাদের জন্য ২৫০০৲ মুদ্রা ব্যয়ে কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারের অভিনয় হইবে। ইহা কি ইংরাজি শিক্ষা,স্বদেশী ও পুনরুত্থানের পরিণাম? পদ্মা ও ঢোল সমুদ্র এক যোগে এ কলঙ্ক-কালিমা ধৌত করিতে পারিবেনা বলিয়াই কি মান্দারতলার খাল শুষ্ক হইয়া গেল? সেই একদিন ছিল যখন, বঙ্গবিদ্যালয়ের পূজ্যপাদ পণ্ডিত স্বর্গীয় শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী এবং জিলাস্কুলের পূজনীয় প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন ধীরে ধীরে নব্য ফরিদপুরের নৈতিক জীবন গঠন করিতেছিলেন, ভারতের সুপুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদারের প্রথম যৌবনের উৎসাহময় কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, সুহৃদ্ সভার পক্ষ হইতে নব্য-ভারত-সম্পাদক কর্ম্মবীর সেবাব্রতার শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সকল অপমান ও নির্য্যাতন তুচ্ছ করিয়া নীতি ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করিতে ফরিদপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছিলেন এবং পুনরুত্থানের প্রধান নেতা ফরিদপুরগৌরব পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি বাল্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই একদিন, আর এই একদিন, সেদিনে এদিনে হেরি কতই অন্তর।

আমাদের মনে আছে, পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা নগরীতে একবার থিয়েটার গিয়াছিল, কিন্তু স্কুল কলেজের ছাত্রেরা জোট করিয়া ইট পাটকেল ছুড়িয়া সে অভিনয়ের দলকে দেশছাড়া করিয়াছিল। আমরা বালকদিগের ঔদ্ধত্যের আদৌ পক্ষপাতী নহি। আর একবার ফরিদপুরের বাবুরা সখ করিয়া মেয়ে যাবার বায়না করিয়াছিলেন। আমরা দলবদ্ধ হইয়া তাহা বাকট ও পিকেটিং করিয়াছিলাম। আমাদের একজন মাথাভাঙ্গা সহাধ্যায়ী যারা শুনিতে যাইবে বলিয়া জিদ করিয়াছিল। আমরা ভয়ে ভয়ে আমাদের আপদবিপদেসহায় শ্রদ্ধাস্পদ নেতা অম্বিকাবাবুর নিকট নিবেদন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "মেয়ে মানুষের গান শুনিতে এত সাধ! তোরা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছিস! তোদের মা জন্মমাত্র ছাদের গাদার উপর তোদিগকে বলি দেয় নাই কেন? মনে করিয়াছিলাম আমি এবার মেলার গানে যাইব না। কিন্তু দেখিতেছি আমাকে যাইতে হইল। আচ্ছা তোরা বাড়ী যা, আমি দেখ্‌ব, কোন ছেলে গান শুনতে যায়। পরিতাপের কথা অম্বিকাবাবু, কালীপ্রসন্ন-

(২) মৌলবী আওলাদআলি খোন্দকার প্রভৃতি।

বাবু ও দেবীপ্রসন্ন বাবু বাঁচিয়া থাকিতে ফরিদপুরে দুর্নীতির এত প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। স্নেহের ভাই সতীশচন্দ্র কি তাঁহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই আত্মজাতী পদস্খলন ও রুচিবিকারের সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন না? যে ফরিদপুরে বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, স্বর্গীয় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডাক্তার শশীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মাননীয় বাবু আনন্দচন্দ্র রায় ও বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বৈষ্ণব সাধু জগচ্চন্দ্র প্রভৃতির জন্মস্থান, যে ফরিদপুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, ৺শশীকুমার নিয়োগী, ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ও সতীশচন্দ্র মজুমদারের ন্যায় চরিত্রবান, অধ্যবসায়ী, কর্ম্মঠ স্বদেশ-ভক্তের জীবন গঠন করিতে পারিয়াছে সেই ফরিদপুরে আজ এ কি মহাপ্রলয়ের যুগ উপস্থিত? শুনিতেছি, সেখানে শিক্ষক প্রহৃত এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুসন্ধানের ফলে কত গুরু শিষ্য বিতাড়িত হইতেছে। হায় শিক্ষা! হায় নৈতিক উন্নতি!

ফরিদপুরের কথা লইয়া এত নাড়া চাড়া করিতে হইল, কেননা বর্ত্তমান বিপ্লব-যুগে ফরিদপুরের নৈতিক জীবনে যে অবসাদ দেখা যাইতেছে, উহা বঙ্গীয় জাতীয় জীবনের আভাস দিতেছে। বহু যুগের দাসত্বে, বিলাস পরতন্ত্র পতনোন্মুখ মুসলমান-সম্রাটদিগের দৃষ্টান্তে, তামসিক সমাজের কুশিক্ষায় আমাদিগের নৈতিক মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে। বিন্দু বিন্দু শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভাঙ্গাহাড় যোড়া দিয়া যদি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলে কি আমাদের এখন নাচ গান ও থিয়েটারের অবসর আছে? যাহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য, অপরিমিত শক্তি, অসাধারণ ক্ষমতা, নৃত্য-গীত-আমোদ আহ্লাদ তাহাদের জন্য। যাহাদের উদারান্নের সংস্থান নাই, মাথায় তৈল নাই, পরিধানে বসন নাই, যাহাদের পিতামাতা ভাইবোন অন্নবিনা ক্ষুধায় মরিতেছে, শিক্ষার অভাবে মলিন, ঔষধ বিনা রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের কি থিয়েটার সাজে? কাঙ্গালের ছেলে লজ্জায় মাথা খেয়ে আবদার করিয়া বাজরেশ ধরিলে পাড়া প্রতিবেশী ঘুরো জ্বালিয়া মুখে আগুন দিবে যে!!

শ্রীরসিকলাল রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৫৮। মর্ম্মভেদী। শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী প্রণীত, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই কবিতা পুস্তক বালক ধ্রুবলালের মৃত্যুতে তাহার জননীর শোক গাথা। জননীর অশ্রুজল চিরদিনই গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র। সমালোচনা দ্বারা সেই দিব্য ভাবোচ্ছ্বাসের অবমাননা করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

৫৯। বঙ্গের শব্দসিন্ধু। শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত, মূল্য ১।০। দেশাবা, আরবী, পার্সী, উর্দ্দু, হিন্দী, পর্ত্তুগিজ, ডেনিক ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী প্রভৃতি যাবতীয় শব্দের শিষ্ট প্রয়োগ সমন্বিত বাঙ্গালা অভিধান পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষানুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ উপকারে আসিবে।

৬৩। Jayaji Protap—Birthday number সুন্দর সুন্দর চিত্র-সম্বলিত সুন্দর সংস্করণ। পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম।

৬৪। The Twenty-fifth Annual Report of the Lowis Jubilee Sanitarium, Darjiling 1911. এই আশ্রমের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সুন্দর ভাষায় শৃঙ্খলার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িয়া সুখী হইলাম।

৬৫। Lilabati (A Drama) by Ram Sanker Ray. উৎকল ভাষায় লিখিত।

রাজনীতি ও সাহিত্য।

দশজনের যাহা মত, বিশেষত প্রসিদ্ধ-লোকের যাহা মত, তাহার সহিত যাহার মত মিলে না, লোকে তাহাকে দাম্ভিক বিবেচনা করে। কারণ সংসারের অধিকাংশ লোকই সুচারুরূপে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য যে শ্রম আবশ্যক হয়, সে শ্রম স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, আর কতক লোক বিচার করিতে এক প্রকার অসমর্থ। তাঁহারা প্রসিদ্ধ লোকের মত অবিচারিত চিত্তে অনুসরণ করা সহজ ও নিরাপদ বিবেচনা করেন, এবং যাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহাদিগকে দাম্ভিক স্থির করেন। আমার যাহা মত, তুমিও যদি সেই মত প্রকাশ কর, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইব, তোমাকে বুদ্ধিমান বলিব। আর আমার যাহা মত, তুমি যদি তদ্ বিপরীত মত প্রকাশ কর, বা আমার প্রতিবাদ কর, আমি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইব, তোমার বুদ্ধি কম স্থির করিব। মনুষ্য-হৃদয়ের এমনি দুর্ব্বলতা, যুক্তি অহমিকার মোহে এমনি আচ্ছন্ন। কিন্তু ভাল করিয়া যদি দেখি, তাহা হইলে বুঝিব যে, যাহার মত আমার মতের প্রতিধ্বনি মাত্র, তাহার নিকট আমার শিক্ষা করিবার কিছুই নাই, আর যাহার মত আমার মতের বিপরীত, তাহার নিকট হয়ত কোন নূতন যুক্তি শুনিতে পাইতে পারি, হয়ত নূতন আলোক পাইতে পারি, হয়ত তাহার সহিত বিচার করিয়া আমার কোন ভ্রম থাকিলে তাহা সংশোধন হইতে পারে। কিন্তু হায়! সে কথা জানিয়াও তাহা সকল সময় স্মরণ রাখিতে পারি না। সকল সময় বিনীত ভাবে নিজের মত প্রকাশ করিতে পারি না, এবং প্রশান্ত প্রফুল্ল চিত্তে স্বকীয় মতের প্রতিবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। যাহা হউক, আপাততঃ দুই একটী কথা আমি বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি।

লর্ড কারমাইকেলের নিকট মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটীর অভিনন্দন পত্রে তিনটী অনুরোধের মধ্যে এই একটী অনুরোধ করা হইয়াছে যে, মেদিনীপুর জেলার বিভাগ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা রহিত করা হউক। এই প্রস্তাবটী আমি অনুমোদন করি, কিন্তু বঙ্গদেশ বিভাগ ও জেলা বিভাগ সম্বন্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি করা হয়, তাহা আমার বিবেচনায় যুক্তিমূলক নহে। আমার বিবেচনায় এইরূপ বিভাগের প্রধান আপত্তি এই যে, ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়। যদি ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়া, দেশকে বা জেলাকে বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি নাই, এবং কোন কোন বিষয়ে সুবিধাও হইতে পারে। অপরিহার্য্য কারণ অভাবে, ব্যয়বৃদ্ধি একটা মহা অমঙ্গল—পরিণামে প্রজা ও রাজা উভয়েরই পক্ষে তাহা অনিষ্টজনক। এই কারণে বিভক্ত বঙ্গদেশ যেরূপ ভাবে সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের পক্ষে যে পরিণামে মঙ্গল হইবে, তাহা আমার মনে হয় না। পূর্ব্বে বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে দুই ভাগের অধিক ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মোটের উপর পূর্ব্ব বিভাগের অপেক্ষা ব্যয় বাড়িবে বই কমিবে না। বঙ্গ সংযুক্ত হওয়ায় যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তৎ

সম্বন্ধে আমি যত মন্তব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে নব্যভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধে, আমার বিবেচনায়, স্বাধীন-চিন্তা-শীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও আমাদিগের নেতাদিগের মত অর্থাৎ চলিত মত উক্ত মতের বিপরীত।

বঙ্গদেশ বিভাগ সম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা করা আবশ্যক নহে। আমাদিগের দেশের নেতাদিগের প্রার্থনা অনুসারেই গবর্ণমেণ্ট প্রজারঞ্জনের জন্য, বিশেষ বিবেচনা করিয়া, অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক বঙ্গ বিভাগ রহিত করিয়া, তাহা সংযুক্ত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রজারঞ্জনের এই চেষ্টার জন্য আমাদিগের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমরা ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট এক দিকে যেমন ব্যয় বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, অন্য দিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিবেন। কোন কোন স্থলে তাহার চেষ্টাও করিতেছেন। প্রস্তাবিত জেলা বিভাগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, কার্য্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, বড় বড় জেলা বিভাগ না করিলে সুশাসন হওয়া কঠিন। তাহার উত্তর এই যে, (১) প্রজাবর্গ, কি ধনী কি দরিদ্র, প্রায় কেহই সুশাসনের অভাব দেখিতে পাইতেছে না, অনুভব করিতেছে না। (২) যদি তর্কস্থলে এমন ধরিয়া লওয়া যায় যে, জেলা বিভাগ করিলে সুশাসন পক্ষে কিছু সুবিধা হইবে, তাহা হইলেও ইহা বিবেচ্য যে, এইরূপে এক পক্ষে যে সুবিধা হইবে, অপর পক্ষে ব্যয় বৃদ্ধি বশতঃ অধিক কষ্ট হইবে। (৩) ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়া সুশাসনের উন্নতি করা যাইতে পারে। এই দেশীয় উপযুক্ত অবৈতনিক লোকের হস্তে অধিকতর পরিমাণে ভার ও ক্ষমতা অর্পণ করিলে, ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়া অনায়াসে সুশাসনের উন্নতি হইতে পারে। এ বিষয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না। প্রয়োজন হইলে পরে তাহা আবার আলোচনা করিব।

এক্ষণে রাজনীতি ছাড়িয়া, অন্য বিষয় আলোচনা করা যাউক। আবার বাৎসরিক সাহিত্য-সম্মিলন হইবে। কে সভাপতি হইবেন, তাহার বিচার হইতেছে। অনেকে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অনুকূলে মত প্রকাশ করিতেছেন। তিনি গত বৎসর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে দুইটী বিষয় আমার বিশেষ প্রশংসনীয় বোধ হইয়াছিল—তাঁহার আন্তরিক সাহিত্য-সেবা ও স্পষ্টবাদিতা। তিনি কোন ধনী বা পদস্থ ব্যক্তির মুখাপেক্ষা করিয়া কোন কথা গোপন করেন নাই। তাহার হৃদয়ের উৎস হইতে সাহিত্য-ভক্তির পূত বারি উত্থিত হইয়া স্বদেশবাসীর নানাবিধ গভীর দুঃখের দিকে ছুটিয়াছে। সে কাহিনী এমন মর্ম্মস্পর্শী যে, তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের অশ্রু বিগলিত হইয়াছিল। তিনি স্বাধীন ভাবে দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, ফাটা ফুটা পাথরের টুকরা সংগ্রহ করার অপেক্ষা সাহিত্য-পরিষদের উচ্চতর কর্ত্তব্য আছে। হায়! দেশের মানুষ, জীবন্ত মানুষ যে শোচনীয় ভাবে ফাটা ফুটা হইয়া যাইতেছে। ম্যালেরিয়া, জলকষ্ট, অন্নকষ্ট, এবং বিবিধ সামাজিক ব্যাধি—এই যে গভীর শোকময় "ট্রাজেডি" বঙ্গদেশের মঞ্চভূমিতে অভিনীত হইতেছে, তাহা অহরহঃ দেখিয়াও কি কোন সাহিত্যিকের হৃদয় সিক্ত হইয়া, পবিত্র সহানুভূতির আবেগে, গভীর স্বদেশ-প্রেমের তীব্র উত্তেজনায়, সাহিত্য-পরিষদে,

অথবা সাহিত্য-সম্মিলনে, একটা নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইবে না? স্বদেশবাসীর জাতীয় স্বাস্থ্যের দৈনন্দিন অধোগতি, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, যন্ত্রণা-নৈরাশ্য, জনপদ সমূহের ক্রমিক ধ্বংস, তাহার উপর ক্ষিপ্ত বিলাসের তাণ্ডব নৃত্য, স্বজাতির সুখ দুঃখ, ইহারা কি প্রকৃত সাহিত্যের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র নহে?

মহাশয়গণ! আমার বিনীত নিবেদন — দেশ ফাট ফুটা পাথরের সাহিত্য চাহে না। দেশ উষ্ণশোণিত-স্পন্দিত মনুষ্য-হৃদয়ের সাহিত্য চাহে। দেশ সেই সাহিত্য চাহে, যে সাহিত্য মানুষকে মানুষ করিতে পারে, যে সাহিত্যগুণে স্বদেশবাসী, সুস্থদেহে, সুস্থমনে পরস্পরের প্রেমে আলিঙ্গিত হইয়া, আনন্দিত হইয়া, বিকশিত হইয়া, স্বর্গধামের দিকে অগ্রসর হইবে। একটী একটী প্রতিভাশালী হৃদয়বান্ ব্যক্তি একটী একটী সাহিত্য-পরিষদ। আমার বোধ হয়, বঙ্কিম বাবু একাই একটী প্রকৃত সাহিত্য-পরিষদ ছিলেন। আহা। দেশের দুঃখের সহিত তাহার কি সহানুভূতিই ছিল! তাঁহার লেখনীর গোমুখী হইতে, জাহ্নবীর পুণ্য সলিলধারার ন্যায়, হৃদয়ের সাহিত্য নিঃসৃত হইয়া জন্মভূমিকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিয়াছে। ভূদেব বাবুও একটী সাহিত্য-পরিষদ। আর ইংরাজি-সাহিত্য? এমার্সনের এক একটী বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করুন। তাহা পাঠ করিয়া আপনার মন যেন পবিত্রতার, ভ্রাতৃভাবের, সত্যবাদিতার সরোবরে অবগাহন করিবে, আধ্যাত্মিক শক্তির বিদ্যুৎ শরীর মধ্যে ছুটিতে থাকিবে। তখন পাঠক অনুভব করিবেন, আমি মানুষ, আমি পশু নহি, তদপেক্ষা উচ্চ, আমি দেবতা। সেইরূপ কার্লাইলের সাহিত্য, রস্কিনের সাহিত্য, তলস্তয়ের সাহিত্য। সাহিত্য-পরিষদে এতগুলি মহাপণ্ডিত, সুলেখক, গুণী ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়াছেন—সাহিত্য-সম্মিলনে দিগ্‌দেশ হইতে এতগুলি সাহিত্যিক মহারথী সমবেত হন—দেশের যাঁহারা বন্ধু গৌরব, আশা ও ভরসা স্থল, তাঁহারা বৎসরে একবার করিয়া সাহিত্যের ধর্ম্মক্ষেত্রে সমাগত হন—তাঁহাদিগের নিকট প্রাচীন ভগ্ন শিলাখণ্ড সংগ্রহ ও জীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথি আহরণ অপেক্ষা মহত্তর আর কিছু কি আমরা আশা করিতে পারি না? সুপণ্ডিত লর্ড রোজবেরি লাইব্রেরী সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন যে, "মনুষ্য জীবন এমন হ্রস্ব যে, আমার বিবেচনায় বৃহৎ লাইব্রেরির অনেক গ্রন্থ দগ্ধ করিলে পাঠকদিগের যথার্থ উপকার করা হইবে।" সে কথার অর্থ যাহাই হউক, আবার বলি, দেশ পোকায় কাটা পুঁথি এবং ফাটা ফুটা পাথরের অপেক্ষা গবেষণার নিকট অধিকতর মঙ্গলজনক আশীর্ব্বাদ বা বর চাহে। সাহিত্য-পরিষদ ও সাহিত্য-সম্মিলন একটা বিরাট আয়োজন—তাহার ফল বিরাট বিভ্রাট হইলে কি দুঃখের বিষয়, বিরাট দুঃখের বিষয় হইবে না? ভরসা করি, গত বৎসর অক্ষয় বাবু সাহিত্যের যে উচ্চ ও পবিত্র উদ্দেশ্য সূচনা করিয়াছিলেন, এই বৎসর সাহিত্য-সম্মিলনে তদনুসারে সাহিত্যের বিকাশ হইবে, সাহিত্য-সম্মিলনের নবপর্য্যায় আরম্ভ হইবে এবং ভগ্ন প্রস্তর-সঙ্কুল-সাহিত্যের পরিবর্ত্তে, হৃদয়ের সাহিত্য পাইব। ভরসা করি, সাহিত্য-সম্মিলনের মহাপণ্ডিত ও সুলেখকগণ কৃপা-পূর্ব্বক আমার এই বিনীত আবেদন নিবেদনার্থ অনুকূল হস্তে গ্রহণ করিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

সপ্তলোকতত্ত্ব।

"সপ্তলোকের" কথা আমরা অনেকেই শুনিয়াছি—কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্ত্ব আমরা অনেকেই অবগত নহি। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার জন্যই উপস্থিত প্রবন্ধটীর সূচনা হইয়াছে।

পৃথিবী এবং পৃথিবীর ঊর্দ্ধে যে কয়টী স্থান নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, এই সাতটীই সপ্তলোক বলিয়া কথিত হয়। এই সপ্তলোকের নাম যথাক্রমে ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য। এই সপ্তলোকের সংস্থান পুরাণে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"পাদগম্যন্তু যৎকিঞ্চিদ্বস্তি পৃথিবীময়ম্।
স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্যময়োদিতঃ॥ ১৬
ভূমি সূর্য্যান্তরং যত্তু সিদ্ধাদি মুনিসেবিতম্।
ভুবর্লোকস্তু মোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তমা॥ ১৭
ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যত্তু নিযুতানি চতুর্দ্দশ।
স্বর্লোকঃ সোঽপি কথিতো লোকসংস্থান চিন্তকৈঃ॥ ১৮
ত্রৈলোক্য মেতৎ কৃতকং বিপ্রেশ্চ পরিপর্য্যতে
জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতম্ ত্রয়ম্॥ ১৯
কৃতকাকৃতকো মধ্যে মহর্লোক ইতি স্মৃতঃ।
শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোঽন্তং ন চরিনশ্রুতি॥ ২০
এতে সপ্তমহালোকাময়াবঃ কথিতা দ্বিজাঃ। ২১

"যে কিছু পাদগম্য পার্থিব বস্তু আছে, তাহা ভূর্লোক আখ্যায় অবিহিত। এই ভূর্লোকের বিস্তার আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হে দ্বিজগণ। ভূমিও সূর্য্যের মধ্যভাগে যে সিদ্ধমুনিসেবিত স্থান, তাহার নাম ভুবর্লোক; ধ্রুবস্তু সূর্য্যের অন্তরালে যে চতুর্দ্দশ নিযুত যোজনস্থান, লোকস্থিতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে তাহার নাম স্বর্লোক। বিপ্রগণ এই ত্রৈলোক্যকে কৃতক এবং জন তপ ও সত্য, এই লোকত্রয়কে অকৃতক আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। ঐ ত্রৈলোক্য ও জন তপঃ প্রভৃতি লোকত্রয় ইহাদের মধ্যভাগে মহর্লোক কৃতাকৃতক নামে কথিত। এইলোক শূন্যময়, কিন্তু কল্পান্তে ইহার নাশ নাই।"

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে "ত্রৈলোক্য" নামে সমস্ত বিশ্ব বলিয়া আমাদের নিকট যাহা সুপরিচিত, তাহা ভূ ভব ও স্ব, সপ্তলোকের এই তিনলোকেই মাত্র বুঝায়। ইহাদেরও পরে আরও বৃহত্তর চারিটী লোক ঊর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং এই সপ্তলোক যে কিরূপ বিস্তার, তাহা আমরা ইহা হইতেই অনুমান করিতে পারিতেছি।

পূর্ব্ববর্ণিত লোক সকলের উপাদান ও বিস্তার পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"ভূমের্দ্দশ গুণাশ্চাপঃ সমন্তাৎ পালয়ন্তিগাম্।
অষ্টোদশগুণশ্চাগ্নিঃ সর্ব্বতো ধারয়ত্যপঃ॥ ৪৯
অগ্নের্দ্দশগুণো বায়ু ধারয়ন্ জ্যোতিরাস্থিতঃ।
তির্য্যক চ মণ্ডলো বায়ুর্ভূতান্যো বেষ্ট্য ধারয়ন্॥৫০
দশাধিকঃ তথাকাশং বায়োর্ভূতান্য ধারয়ৎ।
ভূতানি ধারয়ন্ ব্যোম তস্মদ্দশগুণন্তু বৈ॥ ৫১
ভূতাদিতোদশগুণং মহাভূতান্য ধ্যায়া।
মহত্তত্ত্বং হ্যনন্তেন অব্যক্তেন ভূ ধার্য্যতে॥ ৫২
মৎস্যপুরাণ ১২৩ অধ্যায়।

"ভূমির দশগুণ জল। এই জল পৃথিবীকে ভাসাইয়া রাখিয়াছে। জলের দশগুণ অগ্নি, উক্ত জলরাশি ধারণ করিতেছে। অগ্নির দশগুণ বায়ু সর্ব্বতঃ সেই অগ্নিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই বায়ু তির্য্যক্ ও মণ্ডলাকার। বায়ু অপেক্ষা দশগুণ আকাশ, সেই বায়ুকেও ধারণ করে। পরম্পরা সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বভূতেরই আধার। ইহাপেক্ষা দশগুণ ভূতাদি অহঙ্কার, সেই আকাশমণ্ডলকেও ধারণ করিতেছে। ভূতাদি হইতে দশগুণ মহত্তত্ত্ব সেই ভূতাদিকেও ধারণ করিতেছে। এই মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত অনন্ত কর্ত্তৃক ধৃত রহিয়াছে।"

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার ক্রমানুসারেই লোক সকলের উপাদান ও অবস্থান কল্পিত হইয়াছে। প্রথমেই পঞ্চভূতাত্মিকা স্থূলাক্ষিতি, তদূর্দ্ধে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মজল, তদূর্দ্ধে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তেজ—ইহার উর্দ্ধে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বায়ু ও ইহারও উর্দ্ধে আরও সূক্ষ্ম আকাশ; আকাশের পর মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ তন্মাত্র রূপ ভূতোপাদান, তন্মাত্রের পর শুদ্ধ সত্তারূপী অব্যক্ত। এই সপ্ত উপাদানের দ্বারাই সপ্তলোক যথাক্রমে গঠিত হইয়াছে, যথা—স্থূলাক্ষিতি দ্বারা ভূলোক, স্থূল জলের দ্বারা ভুবর্লোক, স্থূল তেজের দ্বারা স্বর্লোক—স্থূল বায়ুর দ্বারা মহর্লোক—স্থূল ব্যোমের দ্বারা তপোলোক এবং অব্যক্ত সত্ত্বের দ্বারা সত্যলোক। বর্ত্তমানে বিজ্ঞান পৃথিবীতেই সৃষ্টির শেষ পরিণাম দেখিতে পাইয়াছে এবং অদৃষ্ট লোক সকল সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে বিদ্যমান্ আছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছে। সুতরাং পুরাণের বর্ণনা অমূলক বলা যাইতে পারে না।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন লোক সকলের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, পুরাণে তাহার পরিষ্কার উল্লেখই পাওয়া যায় যথা—

"অস্যাস্তস্য সমন্তাচ্চ সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ।
পৃথিবীমণ্ডলং কৃৎস্নং ঘন তোয়েনধার্য্যতে ॥ ২৮
ঘনোদধি পরেনাথ ধার্য্যতে ঘন তেজসা।
বাহ্যতো ঘন তেজস্তু তির্য্যগূর্দ্ধন্তু মণ্ডলম্ ॥ ২৯
সমন্তাদ ঘন বাতেন ধার্য্যমাণং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঘন বাতস্তথাকা ঘনাকাশশ্চ মহাত্মনা ॥ ৩০
ভূতাদিনাবৃতং সর্ব্বং ভূতাদি র্মহতাবৃতঃ।
বৃতো মহাননন্তেন প্রধ নেনাবায়াত্মনা ॥ ৩১

৫৫ অধ্যায়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

"পূর্ব্বোল্লিখিত অণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘন জল পূর্ণ সমুদ্র আছে, সেই ঘনজলে বিধৃত হইয়া এই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে। সেই ঘনোদধি তৎপরবর্ত্তী ঘন তেজের দ্বারা, সেই বক্রাকার ঊর্দ্ধগত মণ্ডলাকার তেজ ঘন বায়ুর দ্বারা,আকাশ তন্মাত্র দ্বারা,তন্মাত্র মহত্তত্ত্ব দ্বারা এবং মহত্তত্ত্ব মহান্, অনন্ত, অব্যয়াত্মক মূল তত্ত্ব দ্বারা আবৃত ও ধৃত হইয়া অবস্থিত আছে।"

বর্ণিত লোক সকল কার্য্যকারণ ও ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবে পরস্পরকে সংশ্রয় করিয়া যে বর্ত্তমান্ রহিয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে পরিস্ফুট হইবে :—

"এতে সপ্তকৃতা লোকাশ্ছত্রাকারা ব্যবস্থিতাঃ।
স্বকৈ বাবরণৈঃ সূক্ষ্মৈ র্ধার্য্যমানা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৬
দশ ভাগাধিকাভিশ্চ তাভিঃ প্রকৃতিভির্ব্বহিঃ ॥
ধার্য্যমানা বিশেষৈশ্চ সম্যুপস্থৈঃ পরস্পরম্ ॥ ২৭

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৫৫ অধ্যায়।

এই সপ্তধাকৃত লোক ছত্রাকারে ঊর্দ্ধক্রমে অবস্থিত। উল্লিখিত লোক সকল

পরস্পর হইতে সম্যুপন্ন হওতঃ দশগুণাধিক সূক্ষ্মকরণাত্মক আবরণ বিশেষে ধৃত হইয়া সর্ব্বদা সংস্থিত আছে। প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, সমগ্র সৃষ্টিশৃঙ্খলাই সপ্তলোকে অনুস্যূত রহিয়াছে। মর্ত্যলোক হইতে সৃষ্টি বিবর্ত্তিত হইয়া যেমন ভূলোকে বিশ্রান্ত হইতেছে, তেমনই ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি পুনরায় সত্যলোকে উপসংহৃত হইতেছে। এইপ্রকারে সৃষ্টি-স্রোতের চির আবর্ত্ত চলিয়াছে। সুতরাং সৃষ্টিরহস্য আমাদের পরোক্ষ বা দূরবর্ত্তী নহে, তাহা আমাদের পুরোবর্ত্তীরূপে নিত্য বিদ্যমান্।

কেবল যে আধিভৌতিক ভাবেই সপ্ত-লোকের সহিত আমাদের যোগ, তাহা নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবেও আমাদের সহিত ইহার যোগ। যেমন ভূলোকের ভৌতিক স্থূলাবস্থা হইতে ক্রমে আমরা সত্যলোকের চরম অব্যক্ত সূক্ষ্মাবস্থায় উপনীত হই, তেমনই আমরা ভূলোকের ইন্দ্রিয়াদির স্থূলাবস্থা হইতে সত্যলোকের পরমাত্মার পরম সূক্ষ্মাবস্থায় উপনীত হইতে পারি। এই জন্যই ঊর্দ্ধলোক সকল উত্তরোত্তর অধিক উচ্চ-আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষসম্পন্ন লোকদিগের দ্বারা অধ্যুষিত বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা :—

"ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকোযত্রতে কল্পবাসিনঃ।
এক যোজন কোটীতু মহর্লোকো বিধীয়তে। ১
দ্বে কোট্যৌ তু জনা লোকো যত্রতে
ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
সনন্দনাদ্যাঃ কপিলা বিপ্রাশ্চামল চেতসঃ॥ ১৬
চতুর্গুণোত্তরং চোর্দ্ধাং জনলোকাত্তপঃস্মৃতম্।
বৈরাজ্য যত্রতে দেবাঃ স্থিতাদেহ
বিবর্জ্জিতাঃ॥ ১৪
ষড়্গুণেন তপো লোকাৎ সত্যলোকো
বিরাজতে।
অপুনর্মারকং যত্র সিদ্ধাদি মুনি সেবিতম্॥ ১৫
২৩ অধ্যায়—ব্রহ্মপুরাণ।

"ধ্রুবস্থানের ঊর্দ্ধে মহর্লোক, এই লোকে কল্পবাসিগণের বাস। এই মহর্লোকের পরিমাণ এক কোটী যোজন, জনলোক দুই কোটী যোজন· এই লোক সনন্দনাদি বিমলচিত্ত ব্রহ্মানন্দনগণের বাসভূমি বলিয়া নির্ণীত। জনলোক হইতে চারিগুণ ঊর্দ্ধে তপোলোক অবস্থিত। এইলোকে বৈরাজ নামক দেহ-বিহীন দেবগণ বিরাজমান। তপোলোক হইতে ছয়গুণ ঊর্দ্ধে সত্যলোক বিরাজিত। এই লোকে সিদ্ধ মুনিগণের বাস। এখানে আসিলে পুনরায় আর মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।"—বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

আধিভৌতিক দিক্ দিয়া যেমন সপ্ত-লোকের মধ্যে আমরা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা দেখিয়াছি, আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়াও তদ্রূপ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন দ্বারা পার্থিব দেহ-ত্যাগের পর আমাদের লিঙ্গদেহ, ঊর্দ্ধালোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। পুণ্যের ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্তির ইহাই অর্থ। স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দেবগণের মর্ত্ত্যদেহ ধারণ ও এই তত্ত্ব দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। সূক্ষ্ম কারোণোপাদানের বিকৃতি দ্বারা যেমন স্থূল ভূতের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ নির্ব্বিকার আধ্যাত্মিক সত্ত্বার অপকর্ষ দ্বারাও পার্থিব স্থূল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেহের সৃষ্টি হয়।

আমাদের ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, রুদ্রলোক, সত্যলোকেরই নামান্তর মাত্র। সপ্তলোকের আধ্যাত্মিকতা কেবল যে হিন্দুদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ, তাহা নহে। আমাদের সপ্তম বা সত্যলোকের অনুকরণে পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্ম্মা-বলম্বিদের মধ্যেও আমরা Seventh Heaven or সপ্তমস্বর্গের কল্পনা দেখিতে পাই।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তপোবন।

তপোবনের নাম শ্রবণ করিলেই মনে কেমন একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়, সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে মন পবিত্র হইয়া উঠে: কি যেন এক স্মরণাতীত যুগের কথা মনে উত্থিত হইয়া মনকে আত্মহারা করিয়া ফেলে। যখনি আমরা এতদ্বিষয়ের কিছু শ্রবণ করি, তখনি যেন অবশ ভাবে তৎসংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিষয়ের কথা, আপনা হইতে, স্মৃতি-পটে জাগিয়া উঠে।

তপোবন বলিলেই আমরা বুঝি যে, ইহা একটী বনস্থলী,—এখানে কতকগুলি বৃক্ষ, ওখানে লতাগুল্ম, কোথাও কুমুদ কহ্লার পরিশোভিত সুন্দর সরোবর, কোন স্থানে জীর্ণ, ক্ষুদ্র পর্ণশালা, নানাবিধ সুরম্য কুসুম-দাম-শোভিত তরুগুল্মরাজি-সমন্বিত নির্জ্জন স্থান, যেখানে তপস্বী বা তপস্বিনীগণ সংসারের যাবতীয় ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, অনিত্য সুখের আশা ত্যাগ করিয়া, নিরন্তর তপঃ নিরত। পরন্তু ইহা সাধারণ বনস্থলী রূপে গণ্য হইবার নহে। এতদ্ব্যতীত তপোবনের এমন একটী পরিপাট্য আছে—এমন একটু মাধুর্য্য আছে, যাহা প্রকৃতই চিত্ত-বিনোদক, সুতরাং পবিত্র ধর্ম্ম-ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। যখনি আমরা পাঠ করি, কৈলাসের চারিভিতে, নানাবিধ চিত্ত-বিনোদনকারী সুর-পুন্নাগ-শাখা পরিবেষ্টিত হিমাদ্রি শিরে তাপস-শ্রেষ্ঠ শূলপাণীর সেই,—

"পর্য্যঙ্ক বন্ধ স্থির পূর্ব্বকায় মৃজ্জায়তঃ সন্নমিতোভয়াংসম্।"
উত্তান পাণিদ্বয়নিবেশাৎ, প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্ক মধ্যে॥
জুম্ভাঙ্গযোনদ্ধ জটাকলাপং, কর্ণাবসক্ত দ্বিগুণাক্ষ সূত্রম।
কণ্ঠ প্রভাসঙ্গ বিশেষ নীলং, কৃষ্ণত্বচং প্রস্থিমতী দধানম্॥

(ইত্যাদি) তরঙ্গ বিরহিত পয়োনিধির ন্যায় স্থির নিষ্কম্প মূর্ত্তি মনে পড়ে, তখনি হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে।

আমাদের এই ভারতবর্ষ চিরদিনই ধর্ম্ম-ক্ষেত্র নামে পরিগণিত। অতি স্মরণাতীত যুগ হইতে ঐশ্বর্য্য, সভ্যতা, রীতি-নীতি প্রভৃতি সদ্বৃত্তি নিচয়ে সমুন্নত ছিল। যেদিন মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশ সমূহ পৃথিবীর মানচিত্রের কোন এক অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত ছিল, লোকলোচনের অন্তরালে ছিল, তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এই ভারতবর্ষ সকল ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া আপন গৌরবে উন্নত। মানবগণ প্রকৃতই সত্ত্বভাবাবলম্বী ছিল, আর্য্য ঋষিগণ ও অপর সাধারণ জাতিগণও সাবাদিন আপনাপন বৃত্তি বা কার্য্য সমাধা করিয়াও সর্ব্বদা দেবতাদিগের পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিত। তদ্দ্বারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখ ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইত। পুরাণ প্রভৃতি ইতিহাসে এতদ্ সম্বন্ধে প্রভূত প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। পুরাকালে নান্দীশ্বর নামধেয় জনৈক মানব-তীব্র তপস্যার দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র, প্রবল ও উগ্র তপস্যায় দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ পশ্চাৎ ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। অতএব একাগ্র-চিত্ত হইয়া, শাশ্বত বিষয়ে ধ্যান পরায়ণ হইলে মানব যে কঠিনতর বিষয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে, এমন কি, দেবত্বে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তপোবনই

কি হেতু তপস্যার প্রকৃষ্ট স্থান। শাস্ত্রে এরূপ জানা যায় যে, প্রাকৃতিক দৃশ্য, নির্জ্জনতা, জল, ভূমি, বায়ু প্রভৃতির গুণে চিত্তের প্রসন্নতা ও স্থিরতা সম্পন্ন হয় এবং মন ঔদার্য্যগুণে বিভূষিত হইয়া থাকে। সুতরাং তপোবন বা তদ্রূপ কোন নির্জ্জন, চিত্তাকর্ষক স্থানই তাপস বা সিদ্ধার্থীগণের তপস্যার উপযুক্ত স্থান। তপস্যা ব্যতিরেকে যোগসিদ্ধিও অসম্ভব। "না তপস্বিনো যোগঃসিদ্ধতি।" জল, বায়ু ও স্থান গুণে জীবের বা মানবের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। এ স্থলে নির্জ্জন অরণ্যবাসী ও সমৃদ্ধিশালী বহুল জনাকীর্ণনগরবাসী, এতদুভয়ের যে প্রভেদ কতদূর এবং পরস্পরের স্থান বিনিময়ে পরস্পরের মনোভাব যে কি পরিমাণে পরিবর্ত্তন হয়, মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে, তাহা অভিজ্ঞান শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্ত ও কণ্বশিষ্যদ্বয়ের কথোপকথন পাঠ করিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে। কণ্বঋষির তপোবন দর্শন করিয়া রাজা দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন,—"শান্তমিদমাশ্রমপদম্।" "এই কি মহর্ষি কণ্বের তপোবন? না, অমরাবতীর নন্দন-কানন? এ স্থানে প্রবেশ মাত্রই হৃদয়ে স্বতঃই শান্তির উদয় হয়। ইচ্ছা করে, রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া, প্রাণ ভরিয়া এই বিমল শান্তি-সুখ উপভোগ করি।"

পক্ষান্তরে, কণ্বশিষ্যদ্বয় যখন শকুন্তলাকে লইয়া রাজসভায় গমন করে, তখন নগরের অবস্থা পর্য্যালোকন করিয়া তাহাদের মনোভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে উপলব্ধি হইবে।

শার্ঙ্গ। "মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্ন
স্থিতি রসৌ,
ন কশ্চিদ্বর্ণানাম পথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিত বিবিক্তেন মনসা;
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহ পরীতং গৃহমিব।

এই রাজ-ভবন অনলাক্রান্ত গৃহের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে।

শার্ঙ্গ। "স্থানে খলুপুরঃ প্রবেশাত্তবেদৃশঃ
সংবেগ। অহন্তু,—
অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব,
প্রবুদ্ধইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জ্জনমিহ সুখ
সঙ্গিন মবৈমি॥"

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ভূমি, জল, বায়ু প্রভৃতির গুণে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম দৃশ্যতে যে কেবল মাত্র মানব মনের উৎকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে, তাহা নহে, এমন কি, বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সেই সকল স্থানের এমন একটী অলৌকিক ভাব পরিলক্ষিত হয় যে, তাহা দর্শন করিলেই মনে এক পবিত্র ভাবের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীরামচন্দ্র যখন ভগবান বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার তপোবন দর্শন করিতে যান, তখন তিনি,—

"আলুলোক হুতধূমকেতু
শিখাঞ্জন স্নিগ্ধ সমৃদ্ধ শাখম্।
তপোবনং প্রাধ্যয়নাভিভূত
সমুচ্চরচ্চারু পতত্রি শিঞ্জম্॥

এই সকল দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার তপোবনের মাহাত্ম্য পরিব্যাপ্ত ছিল যে তথায়,

ক্ষুদ্রান্নজক্ষুর্হবিণান্ মৃগেন্দ্রাঃ
বিশশ্বসে পক্ষিগণৈঃ সমন্তাৎ।
নংনম্যমানাঃ ফলদিৎসয়েব
চকাশিরে তত্র লতা বিলোলাঃ॥"

হিংসা সমন্তাৎ বিলুপ্তা, সিংহাদয় মৃগাদীন্ন ববাধিবে। কাকাদয়ঃ জাতিবৈরং বিস্মৃত্য উলূকাদিভিঃ একত্র বিশ্রব্ধং বিচেরু। লতাশ্চ ফলাদৈশ্বর্য্য শোভিতাঃ বাতবিধূনিতাঃ, আগন্তুকেভ্য ফলদানেচ্ছয়েব অবনম্রা আসন্। সুতবাং এরূপ স্থানে যে জীব মাত্রেব মনে এক পবিত্র ভাবেব উদয় হইবে এবং তদ্বাবা মনেব অমর্ষমল বিদূবিত হইয়া অন্তবে সাত্ত্বিক ভাবেব উদয় হইবে, তাহাব আব বিচিত্রতা কি?

তাবপব, নির্জ্জন ও চিত্তবিনোদনকাবী প্রদেশে অবস্থান হেতু, বিষয়াকৃষ্ট মনঃ ও তৎ কর্ম্মচাবী ইন্দ্রিয সকল, ক্রমে ক্রমে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হব।

বহঃ স্থানাসনেন,

হ্রিয়মাণানি বিষয়ৈবিন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্ততে॥"

প্রকৃতই, এইরূপ সুন্দব, মনোবম, পুষ্প-পল্লবলতা-দ্রুমবাজী-সমন্বিত স্থান তপস্যাব উপযুক্ত এবং চিত্তবৃত্তি নিবোধেব প্রকৃষ্ট পন্থা। এস্থলে আমবা মহামুনি অত্রিব আশ্রমেব সৌন্দর্য্যেব বর্ণনা না কবিয়া থাকিতে পাবিলাম না। সেই আশ্রমেব প্রাকৃতিক স্বভাব-জাত সৌন্দর্য্যের বিষয় পাঠ কবিলে বস্তুতঃই অতি বিষয়ান্ধ মানবেবও মন ভক্তি ও আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠে; সেই স্থান প্রকৃতই স্বর্গেব নন্দনকানন বলিয়া প্রতীত হয়। সেই আশ্রমেব,—

"ক্বচিৎ পুষ্পভরা সাবো
ক্বচিৎ ফুল্ল সবঃ সাবো,বৃক্ষশালি শিলঃ ক্বচিৎ॥
বিম্বাধবাশ্রিতগুহো ভৃঙ্গগীতাম্বুজ কবঃ।
কিবাত গীত পর্য্যন্তঃ খগগীত বনদ্রুমঃ॥
অত্র নীলাং শুকচ্ছন্না মূকবত্ব বিভূষণাঃ।
শিলা কনক সৌন্দর্য্যো যত্র ভৃঙ্গা-ভিসাবিকাঃ॥
অত্রোত্তর তটে সানৌ বিনম্র ফলপাদপে।
রত্ন পুষ্করিণী জাল-বহন্নির্ ঝর বারিণি॥

চূতদ্রুমলতোন্মুক্ত পুষ্পস্তবক দন্তবে।
বিকুল্লং কোল পুন্নাগ নীল নীবজ দিক্তটে॥
লতা বিতানচ্ছন্নার্কে রত্নাগুভর ভাস্বরে।
স্রব জ্জম্বুবস স্যূতে স্বার্লোকাহ্লাদকারিণি॥
ব্রহ্মলোক সমঃ স্বর্গবম্যাঃ শিব পুবোপমঃ।
অত্রেবস্ত্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ সিদ্ধাশ্রম হবোমহান্॥

সুতবাং এরূপ স্বর্গলোকহ্লাদকাবিণি সিদ্ধাশ্রম, এহেন চূতদ্রুমলতাবিতান-সমন্বিত স্থানে যে অতি অল্পায়াসে জীবেব চিত্ত-বৃত্তিব নিবোধ হইবে এবং মনেব মলিনতা উন্মার্জ্জিত হইয়া, মন হিংসা দ্বেষ-শূন্য হইবে, তাহাব আব বিচিত্রতা কি?

এস্থলে ইহাও বলিযা বাখা কর্ত্তব্য যে, কেবল মাত্র স্থান-মাহাত্ম্যেই যে জীবেব অন্তবেব সকল মলিনতা দূব হইযা থাকে, অথবা তদ্বাবা জীবেব মুক্তিলাভ ঘটিযা থাকে, তাহা নহে। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল সিদ্ধি লাভেব সহায়ক। তপস্যা বা যোগ সাধনে চিত্তবৃত্তিব নিবোধ হইয়া থাকে। এই জন্যই মোক্ষেচ্ছু জীব বা মানবগণ এইরূপ নির্জ্জন ও চিত্তবিনোদনকাবী স্থানে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা যোগানিবত হইতেন। যে হেতু যোগসাধনা দ্বাবা সাধকেব চিত্তেব সদ্বৃত্তি নিচয়ের স্ফুবণ হইয়া মনেব সঙ্কীর্ণতা, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি, বিপুব নাশ হইয়া থাকে। মিহিবোদয়ে কুজ্ঝটিকাবাশি যেমন ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইতে থাকে, তদ্রূপ, যোগ প্রভাবে অন্তবে সদ্বৃত্তিব উদয়ে চিত্তের অমর্ষমল ক্রমে ক্রমে বিদূরিত কবিয়া থাকে। এইরূপ সাত্ত্বিক গুণ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট আশ্রম বা তপোবনবাসিগণ শ্বাপদসঙ্কুল স্থানেও নিরাপদে, এমন কি, কুত্রাপি জীবজন্তুগণের সহিত একত্র অবস্থান করিতেন।

"অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈর্ব্বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ।

তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্ ॥"

(মঃ সং ৮।৭৫)

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অহিংসা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠায় হিংস্র জন্তুগণও অহিংস্র হইয়া থাকে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিলে বুঝা যায় যে, জীবজন্তুগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম-জ্ঞানে (instinct) অপরাপর জীবগণের মানসিক বৃত্তি বুঝিতে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত মানবগণ অন্তরে হিংসা দ্বেষের আশঙ্কা করে বলিয়াই হিংস্র জন্তুরা তাহাদিগকে শত্রু জ্ঞানে হিংসা করিয়া থাকে। সুতরাং মানবগণ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে হিংসা দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইলে, জন্তুগণ দ্বারা তাহাদের কোন হিংসার আশঙ্কা থাকে না, জীবজন্তুগণও বৈরীভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যথা,—

"অহিংসাং প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।"

(পাঃ দঃ)

অতঃপর মানবগণ অহিংসা ধর্ম্মাবলম্বী হইলে তাহাদের দেহের এমন একটী শ্রী উৎপন্ন হয়, যাহা অতীব মনোরম, তৃপ্তিকর ও বিশ্বাসের আকর বলিয়া প্রতীত হয়। পুরাণে এরূপ উক্তি আছে যে,—

"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ।
ন তস্য সর্ব্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ॥"

সর্ব্বজীবের প্রতি অভয় প্রদান করিলে, তাহাদের দ্বারা কখনও ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। অনেক স্থলে পাঠ করা গিয়াছে যে, তাপসগণ কুরঙ্গ* প্রভৃতি বন্যজন্তুদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া থাকিতেন। কণ্বাশ্রমে, শকুন্তলার মৃগশিশু বেতসলতা-মণ্ডপে, রাজা দুষ্মন্তের হস্তে জল পান না করিয়া শকুন্তলা-প্রদত্ত জল পান করিয়াছিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অরণ্য বা আশ্রমবাসিগণ পরস্পরের প্রতি প্রণয়-ভাজন হইয়া এইরূপই বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠে, তখন আর তাহাদের মধ্যে হিংসা দ্বেষের কোন কারণ থাকে না। আমি কোন এক সাধুর বিষয় অবগত ছিলাম,* তাঁহার কতকগুলি গাভী ছিল এবং একটী ব্যাঘ্র ছিল। ব্যাঘ্রটী নিরামিষ-ভোজী, দুগ্ধ ও আটা প্রভৃতি তাহার আহার্য্য ছিল। অন্য হিংস্র প্রাণী যাহাতে ঐ সকল গাভীগণের প্রতি হিংসা করিতে না পারে, ব্যাঘ্রটী তদ্বিষয়ে পরিরক্ষণ করিত। সাধুর শিষ্য ইন্ধন আহরণের জন্য, তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিজন বিপিনে গমন করিত, এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতঃ সেই ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়া আনয়ন করিত। এইরূপ অনেকানেক বিষয় অবগত হওয়া যায়, সে সকল ধ্রুব সত্য হইলেও অধুনা রূপ-কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

হায়! সেই সুবর্ণ-যুগ, সে সুখের দিন আজ অতীতের অন্ধতামস গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। একদিন যে আর্য্য-সন্তানগণ, জটা-জুট-বিলম্বিত, গৈরিক বসন-পরিহিত, সর্ব্বদা বেদপাঠ-নিরত, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সদা তপঃ-নিরত ছিল, আজ তাহাদের অধঃস্তন বংশধরগণ মোহমদিরায় মত্ত হইয়া, ক্ষণিক বিলাস ও বিভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া, সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আজ এতদূর অধঃপতিত। যাহারা পরের দুঃখে কাতর হইয়া নিজের স্বার্থত্যাগ করিতে, এমন কি, নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, আজ তাঁহাদের বংশধরগণ নিজের আত্মীয় স্বজন, অধিক কি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্ম পরিজন—যাহারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য

* অনেকে তাঁহাকে জানিতেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। (লেখক)

পরমুখাপেক্ষী, তাহাদের প্রতিও কাতরতা প্রকাশ করিতে, সাহায্য প্রদান করিতে, অথবা স্থল বিশেষে আত্মমর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন।

তাই আজ বার্দ্ধক্যের উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া, সমাজ ও সংসারের এই অসম্ভাবিত অধঃপতনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে থাকে, কেন, কি কারণে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারত-ভূমে —কোন্ নৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আজ আমরা এইরূপ হীনাবস্থায় পতিত—শক্তিমানের সমীপে পরাভূত, বুভুক্ষিত, উদরান্নের জন্য লালায়িত—পরপদ-সেবিত?

একটু স্থির, নিবিষ্ট হইয়া দেখিলে বোধ হয়, সহজেই এই অদ্ভুত, অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কারণ উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মহীনতা, সামাজিক রীতিনীতির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন প্রভৃতিই আমাদের এই অধঃপতনের কারণ। আমরা এতদূর মোহাচ্ছন্ন যে, আমরা একবার অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিবারও অবকাশ পাই না। সুতরাং আমরা বর্ত্তমান কালের যে আমাদের শোচনীয় অবস্থা তাহা অনুভব করিতে পারি না, সুতরাং তাহার প্রতিকার সাধনেও পরাঙ্মুখ। এক্ষণে যদি আমরা নিজ নিজ মঙ্গলের জন্য দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, আবার সেই সুবর্ণ যুগের সুখময় দিন প্রত্যাগত হইবে, এই পুণ্যময় ভারত-ভূমি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা হইয়া আবার এই অধঃপতিত দেশ—এই সংসার স্বর্গ সমান হইবে।

তবে এই সকল করিতে হইলে, কিম্বা প্রকৃত সাত্বিক পথে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদের কতকগুলি বিধি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ। তন্মধ্যে আহার-বিধিই প্রধান। কারণ আহারের সহিত আমাদের স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধ। মানুষের দেহ স্বভাবতঃ জড় ও পশুধর্ম্মাক্রান্ত, আহার্য্যাদির গুণ ভেদে মানব তত্তৎগুণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ মনোবৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আহার্য্য সম্বন্ধে আমাদের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যে সকল আহার্য্য সেবনে আমাদের আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা থাকে, দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, সদ্বৃত্তি নিচয়ের প্রস্ফুরণ ও ধর্ম্ম পথের সহায়ক হয়, সেই সকল সাত্বিক আহারই বিধেয়।* আয়ুর্ব্বেদ ও যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে।† সুতরাং এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বলিয়া আশ্রম ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিধায়, এতদ্ সম্বন্ধে, এস্থলে, দুএক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইল।

অতঃপর আচার। ইহাও হিন্দুদিগের ধর্ম্ম পথের অন্যতম সহায়ক। ধর্ম্মের সহিত ইহারও নিত্য সম্বন্ধ। উপনিষদের উক্তি যে, "আচার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতি, স্মৃতি শুদ্ধৌ সর্ব্ব গ্রন্থিনাং বিপ্র-

*"আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যো বলকৃদ্ দৃঢ়ধাবণঃ।
স্মৃত্যায়ু শক্তি বর্ণৌজঃ সত্ত্ব শ্লেষ্মা বিবর্দ্ধনঃ॥
যথোক্ত গুণ সম্পন্নং নরঃ সেবেত ভোজনম্॥"

† বর্ণ প্রসাদঃ সৌস্বর্য্য জীবিত প্রতিভাসুখং।
তৃষ্টি পুষ্টির্বলং মেধা সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতং॥
লৌকিকং কর্ম্ম যদ্ কিঞ্চো স্বর্গতো যচ্চ বৈদিকং।
কর্ম্মাপবর্গে যাচ্চোক্তং তচ্চাপ্যন্নে প্রতিষ্ঠিতং॥"
(চরক।)

জীবন ধারণের জন্য যে সকল লৌকিক কর্ম্ম কলাপ এবং মুক্তি লাভের জন্য যোগ শাস্ত্র বিহিত কার্য্য কলাপ বিদ্যমান, তৎ সমুদয়ই একমাত্র অন্ন বা খাদ্যের উপর নির্ভর করে।

মোক্ষঃ।" আচার শুদ্ধি হইলে মানবের জীবন শুদ্ধি হয়, অর্থাৎ চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া যায় এবং তামসিক বৃত্তি নিচয়ের ধ্বংস সাধিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে, স্মৃতি শক্তির বিকাশ হয় ও মানসিক বলের আধিক্য হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা মানব সকল প্রকার গ্রন্থি মোচন করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ শাস্ত্রীয় আচারাদি গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলে মানবের মনের সাত্ত্বিকতা ও উদারতা সম্বর্দ্ধিত হয়, শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা, ও সৎকার্য্যপটুতা জন্মে। এতএব ধর্ম্মকে উদ্বোধিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের সদাচারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবন্ধং স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচার মতন্দ্রিতঃ॥
আচারল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধন মক্ষয্য মাচারো হন্ত্যলক্ষণম॥"

(মনু ৮।১৫৫।১৫৬)

আচারহীন ও আচার বিশিষ্ট মানব, এতদুভয়ের যে কতদূর পার্থক্য, তাহা আমাদের বর্ত্তমান ও পূর্ব্ব পুরুষগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং এস্থলে সে সকলের বহুল আলোচনা বা শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে যাহাতে আমাদের মনে এই ভাব সর্ব্বদা উদয় হয়, সাত্ত্বিকতা ভাব অন্তরে প্রস্ফুরিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতি জাগরূক করা বা তাঁহাদিগের কীর্ত্তি কলাপ পর্য্যালোচনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, এবং ইহাই সদ্বৃত্তি সম্বর্দ্ধনের প্রধানতম উপায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ আর্য্যশাস্ত্রে এতদ্ সম্বন্ধে, অর্থাৎ জনগণকে ধর্ম্মশীল করিবার জন্য অশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে, তীর্থাদি পুণ্যভূমি পরিভ্রমণ, পরিদর্শন, দেবতাগণের পবিত্র নাম স্মরণ, শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করণ, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রতিপালন করা একান্ত নিত্য কর্ত্তব্য। এই সকল ক্রমে ক্রমে অভ্যাসে আসিলে, মনঃ তখন স্বতঃই সৎ পথে অগ্রসর হইতে বাসনা করিবে, অনিত্য বিষয়াদির প্রতি অনাস্থা হইয়া পড়িবে, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ কলুষিত ভাব সকল (মিহিরোদয়ে তমঃরাশির ন্যায়) বিদূরিত হইয়া যাইবে। ক্রমে মানব,দুষ্ক্রিয়াশীল, বিষয়-মদিরা-মত্ত, ভোগ-বিলাস-বর্দ্ধিত এই মানব, একদিন, আবার সেই আর্য্যদিগের সর্ব্ব বিষয়ে সমুন্নত হইয়া এই সংসারকে স্বর্গ সমান করিতে, আপনাদিগকে প্রকৃত আর্য্য, তপস্বী, এমন কি, দেবতা রূপে গঠন করিতে—ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে, শান্তিময়, পুণ্যময় তপোবন প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। ভারত-মাতার মুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। অতএব,

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত॥"

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

রাজা বিক্রমাদিত্য। (১)

খ্রীষ্ট দশম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতের ইতিহাস, অত্যন্ত গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সময়ে সময়ে কোন বিশেষ বিশেষ কালে, কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া, পার্শ্বিক আলোক দ্বারা এই ঘন-কুজ্ঝটিকার আবরণ কদাচিৎ আলোকিত হইয়াছে মাত্র। ইহারও অধিকাংশ বৈদেশিক বিবরণ হইতেই আসিয়া পড়িয়াছে। সত্যবটে, এ পর্য্যন্ত যত প্রকারের তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সময়ে সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও এই তিমিরাপসরণের অনেক সাহায্য হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারাও ভারতে ঠিক্ ধারাবাহিক ইতিহাস পাইবার দ্বার তত উন্মুক্ত হয় নাই। এতদ্দেশীয় বিভিন্ন প্রদেশের নৃপতিবর্গ প্রচুর পরিমাণে, তাম্র-পত্রে আপনাদের কার্য্যকলাপ বিবৃত করিয়া, ব্যক্তিবিশেষকে গ্রাম বা ভূমি বা মন্দিরাদি দান করিতেন, ঐ সকল তাম্রলিপিতে তাৎকালিক ইতিহাস বিবৃত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু উহা প্রদেশ-বিশেষের বা নৃপতি বিশেষের সাময়িক ও আংশিক ইতিহাস মাত্র। তাহাও আবার উৎকীর্ণ অক্ষরের উদ্ধারের গোলযোগে অনেক সময়ে প্রকৃত নাম, তারিখ ও কার্য্য যথাযথ ভাবে বুঝিয়া উঠিতেও পারা যায় নাই। উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলি সম্বন্ধেও একথা অংশতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে।

ভারতের পুরাণগুলিতে আমরা, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত, কিছু কিছু ইতিহাস প্রাপ্ত হই। ৩২৬-পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস্-নৃপতি আলেক্‌জন্দর ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রবেশ করেন এবং তদন্তর্গত কোন কোন প্রদেশ জয় করেন। এই আলেক্‌জন্দরের শিবিরে মগধ-রাজবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। নীতিশাস্ত্রে প্রখ্যাত চাণক্যের সাহায্যে এবং বিবিধ সভ্য ও অসভ্য সৈন্য লইয়া, চন্দ্রগুপ্ত, মগধের নন্দরাজ্যের উচ্ছেদ করিয়া, আপনি সম্রাট হন। গ্রীক্‌দিগের ইতিহাস এবং আমাদের পুরাণ—উভয়ই এই ঐতিহাসিক বিবরণের সাক্ষ্য দিতেছে। সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস নামক বিখ্যাত নাটকে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি বর্ণিত রহিয়াছে। সম্রাট অশোক এই চন্দ্রগুপ্তেরই পুত্র। ইঁহার সময়ে প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যেরও অধিকাংশ স্থান ইঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। এই বংশীয় নৃপতিবর্গ কালে বিলুপ্ত-প্রতাপ হইলে, ইঁহাদেরই শেষ নৃপতির সেনাপতি পুষ্পমিত্র মগধের সিংহাসন কাড়িয়া লন। অন্ধ্র বা শালিবাহন নৃপতিগণ, মিত্রবংশের বিলোপ সাধন করিয়া রাজা হন। পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রের বিবরণ আমরা কালিদাসের বিখ্যাত নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রে বিবৃত দেখিতে পাই। পাণিনির মহাভাষ্য-প্রণেতা পতঞ্জলি সম্ভবতঃ পুষ্পমিত্রের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

শালিবাহন নৃপতিবৃন্দ মগধের সিংহাসন জয় করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা গোদাবরীর তীরবর্ত্তী পৈঠান-নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহারা দাক্ষিণাত্যের রাজা।

মহারাষ্ট্রে এবং এমন কি, সমগ্র ভারতে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, এই সময়ে উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে শালিবাহন-রাজের একটা সংগ্রাম হইয়াছিল। এই শালিবাহন ও বিক্রমাদিত্য উভয়ই যথাক্রমে শকাব্দার ও বিক্রমাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়াও কিংবদন্তী আছে। এই বিক্রম-অব্দ পূর্ব্ব খ্রীষ্টীয় ৫৭ বৎসরে প্রথম আরব্ধ হয়। এবং শালিবাহনের শকাব্দ খ্রীষ্টের পর ৭৮ বৎসরে আরব্ধ হয়। এই রাজা বিক্রমাদিত্য কে?

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়াই বাহ্লীক নামে একটা জনপদ আছে। উহা ব্যাক্‌ট্রিয়া নামে গ্রীক্‌দিগের ইতিহাসে বিখ্যাত। আলেক্‌জেন্দর ভারত-বিজয়ের পর যখন স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি এই নগরে সৈন্য ও সেনাপতি রাখিয়া যান। বাহ্লীকস্থ এই গ্রীক্ অধিবাসী-বর্গ কালে প্রবল হইয়া উঠেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতের উত্তরাংশও অধিকার করেন। তন্মধ্যে বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ রাজা মিলিন্দই প্রধান ও প্রখ্যাত। ইনি সাকেত বা অযোধ্যা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। পতঞ্জলির ভাষ্যে সম্ভবতঃ এই আক্রমণের কথাই লিপিবদ্ধ আছে।* কিন্তু মগধ-রাজ পুষ্যমিত্র, এই গ্রীক্‌দিগকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে বাহ্লীকস্থ গ্রীক্‌রাজবর্গের প্রতাপ হ্রাস হইতে আরব্ধ হয়। এসিয়া মাইনরস্থ প্রদেশ সকল হইতে এই সময়ে, পতঙ্গপালের ন্যায় কতকগুলি লোক নানাভাগে বিভক্ত হইয়া আফগানিস্থান প্রভৃতি রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা শক নামে বিদিত। ইহাদের প্রবল আক্রমণের সম্মুখে বাহ্লীকনগরস্থ গ্রীক্‌গণও ভাসিয়া যান। পূর্ব্ব-খ্রীষ্ট একশত শতাব্দীতে ইহারা ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অংশে বসতি করিতে আরম্ভ করে। ইহারাই কিছু পূর্ব্বে পারস্য-রাজ্য সংস্থাপিত হয়, এবং এই শকেরা, পারস্য রাজ্যের শাসনকর্ত্তা রূপে ভারতের প্রান্তদেশে স্বাধিপত্য স্থাপন করে। এই সময়েরই কিছু পরে, আর একদল শক-জনস্রোত ইহাদের উপরে আসিয়া আপতিত হয়। ইহারা সে আক্রমণের বেগ সহিতে না পারিয়া, ভারতের মধ্যে প্রবেশ করে। পঞ্জাবের তক্ষঃশীলা-প্রদেশ, গুজরাটের সৌরাষ্ট্র-ভূমিতে, এমন কি, মালবের উজ্জয়িনী-নগরে পর্য্যন্ত ইহারা প্রবেশ করিয়া, দেশীয় নৃপতিবর্গের হস্ত হইতে তত্তৎ প্রদেশের সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া, আপনি রাজত্ব করিতে থাকে। ইঁহারা ক্রমে স্বদেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া, ভারতীয় আচার-ব্যবহার, এমন কি, নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া, দেশীয় নৃপতিবর্গের ন্যায় রাজত্ব করিতে থাকেন। ১২৬ খ্রীষ্টাব্দে শালিবাহন-বংশীয় এক মহারাষ্ট্রীয় নৃপতি, ভারতের পশ্চিমাংশের এক শক-নৃপতি নাহাপনকে পরাজিত করিয়া দূর করিয়া দেন। এই পরাজয়ের পর, সষ্ঠান নামে এক শক-রাজকে, শালিবাহন-রাজ আপনার প্রতিনিধি-রূপে গুজরাট প্রভৃতি ভারত-পশ্চিম-প্রান্তের শাসন-ভার অর্পণ করেন। এই সষ্ঠানের রাজধানী উজ্জয়িনীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রুদ্রদামন ইঁহারই প্রপৌত্র। শালিবাহন রাজবংশের পুলোমী নামক নৃপতিকে ইনি আপন কন্যা দান করেন। কিন্তু জামাতা ও শ্বশুরে সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সংগ্রামে পুলোমী

* "অরুণৎ যবনঃ সাকেতম্।" পুষ্যমিত্র দিগ্বিজয় করিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পতঞ্জলি বোধ হয় এই যজ্ঞে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

পরাজিত হন। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সংঘটিত হয়। উজ্জয়িনীরাজের ও শালিবাহনের মধ্যে এইরূপ কোন যুদ্ধ লইয়াই, পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। পণ্ডিত ভাণ্ডারকার এই অনুমানে উপনীত হইয়াছেন। এই শালিবাহনবংশীয় নৃপতিবর্গ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দ ৭৩ হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

শালিবাহন-বংশীয় হাল বা কুন্তল-রাজ প্রণীত সপ্তশতী নামক প্রাকৃত গ্রন্থ অদ্যাপি প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিখ্যাত বৃহৎ কথা-গ্রন্থ (যাহা বঙ্গের কালীতে, পৈশাচী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে), এই হালরাজের মন্ত্রী গুণাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। কাতন্ত্র ব্যাকরণও, অন্য এক মন্ত্রী কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। আমরা এই যে এক বিক্রমাদিত্যের কথা বলিলাম, ইনি এক অব্দের (৫৭ পূঃ খ্রীঃ) প্রবর্ত্তয়িতা ব্যতীত আর কিছু জানিবার উপায় নাই। কথাসরিৎসাগরে এই বিক্রমাদিত্যের কথা উল্লিখিত দেখা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহাকবি কালিদাস এই বিক্রমাদিত্যেরই সভা-পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু এই অনুমান সত্য বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। কেন হয় না, তাহার কারণ পরে বলিতেছি। অনেকে শালিবাহনকে খ্রীষ্টীয় ৭৮ হইতে যে শকাব্দা প্রচলিত হইয়াছে, সেই শকাব্দার প্রবর্ত্তয়িতা বলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ শক-রাজ কনিষ্ককেই ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া অনুমান করেন। বিক্রমাদিত্য-প্রবর্ত্তিত ৫৭ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে যে বৎসর গণনা আছে, তৎ সম্বন্ধেও একটী কৌতূহলোদ্দীপক সিদ্ধান্ত আছে, কিন্তু সে কথাও আমরা পরে বলিব।

ভারতে কত যে বিক্রমাদিত্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যখনই কোন সম্রাট্ নানা প্রদেশ জয় করিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন, তখনই তিনি এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যেও কত নৃপতি এই উপাধি দ্বারা পরিচিত ছিলেন। আমরা সকল বিক্রমাদিত্যের কথা বলিব না। ভারতের কালিদাস প্রমুখ কয়েকজন সুবিখ্যাত অমর মহাকবি যোন্ বিক্রমাদিত্যের সভাস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

আমরা বলিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যের শালিবাহন বংশীয় নৃপতি-বর্গ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। শক-রাজগণও তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের উত্তর পশ্চিমের কিয়দংশ ও পশ্চিম-প্রান্ত জুড়িয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তৃতীয় শতাব্দীর পরে, আর ইঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। পুরাণ নীরব, তাম্রলিপিও নীরব। ফলতঃ তৃতীয় শতাব্দী একটা তামসযুগ। এই শতাব্দীতে সকলই যেন ডুবিয়া গিয়াছে।

এই তৃতীয় শতাব্দীর অন্তে, ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমরা গুপ্ত-রাজবংশের প্রথম পুরুষের কীর্ত্তি-কথা শুনিতে পাই। মগধ-রাজধানী পাটলিপুত্রে এই বংশের প্রবর্ত্তক চন্দ্রগুপ্ত আপন নামে মুদ্রা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার পুত্রের নাম সমুদ্রগুপ্ত। গুপ্ত-রাজত্ব প্রকৃত-পক্ষে এই সমুদ্রগুপ্ত হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। এই পরাক্রান্ত নৃপতি চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া বিগ্বিদিক্ দুই বৎসরের মধ্যেই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আপন করতলগত করিয়া লন। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত নৃপতি ইঁহার শক্তি ও শাসন মানিয়া লইতে বাধ্য হন। কবি বীরসেন-রচিত অতি মিষ্ট প্রাঞ্জল কবিতা, ইঁহার

কীর্ত্তিকথা অদ্যাপি ঘোষণা করিতেছে। প্রকাণ্ড শিলালিপি উৎকীর্ণ করাইয়া ইনি আপনার দিগ্বিজয়ী কাহিনী প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উজ্জয়িনী ও আসাম পর্য্যন্ত ইঁহার সামন্ত-রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ইঁহারই পুত্র। এই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত ছিলেন। মালব, গুজরাট্ ও সৌরাষ্ট্রে যে সকল শক-রাজত্ব তখনও প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই নৃপতি সেই সকল শকরাজকে ভীষণ সমরে সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত করিয়া শকারি নামেও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৩৮৮ হইতে ৪০১) এই মহা সমর সংঘটিত হয়। কুমারগুপ্ত এই বিক্রমাদিত্যের পুত্র। ইঁহার পর হইতেই এই বংশের শক্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে, স্কন্দগুপ্তের রাজত্ব কালে, হূন-স্রোত ভারতে প্রবেশ করে, কিন্তু স্কন্দগুপ্ত ইহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের রাজত্বকালে, হূন-কেশরী মিহিরকুল একেবারে ইঁহার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করে এবং রাজধানী আক্রমণ করে। নরসিংহ, সিংহ-বিক্রমে, এই মহাশত্রুর হস্ত হইতে ভারত রক্ষার জন্য আয়োজন করেন। মালব-রাজ যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন ইঁহার অধীনে সামন্ত নরপতি ছিলেন। এই মালব-রাজও এই যুদ্ধে সেনা ও অস্ত্র লইয়া বিশেষ সহায়তা করেন। মিহিরকুল সমরে পরাস্ত হইয়া, একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে। তদবধি আর কেহ হূন-দিগের নাম শুনে নাই। কিন্তু গুপ্ত সম্রাট্-গণের ক্ষমতা ক্রমে হীন হইতে হীনতর হইয়া আসিতেছিল। গুজরাটের বলভিরাজ্যে, গুপ্ত রাজন্যবর্গেরই একজন সামন্ত নৃপতি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে আপন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং গুজরাটে বলভিবংশ বা বংশ স্থাপিত হয়।*

অমর কবি কালিদাস, এই গুপ্ত বংশীয় নৃপতিবর্গের মধ্যে যিনি বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারই সভাকবি ছিলেন। আমরা কেন এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছি, তাহার কারণ আগামী প্রস্তাবে বলিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বর্ণতত্ত্ব। (৪)

এক্ষণে কুণ্ডল-কেশ * মানবগণের কথা উল্লেখ করিব। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কুঞ্চিত-কেশগণ † অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাই যে কুণ্ডলকেশগণের মধ্যে নানাবিধ বর্ণই আছে। ইহাদিগকে বর্ণনা করা যাইতেছে।

* Cymotrichi.
† Ulotrichi

লঙ্কার বেদিয়াগণ। ইহারা প্রায় অমিশ্র জাতি, অর্থাৎ ইহাদিগের মধ্যে, † আণ্ডামান-বাসীদিগের ন্যায়, সাংকার্য্য অতি বিরল। এই দুই শাখাই মানবজাতি মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

* এই বলভি নগরের সেন-রাজ শ্রীধরসেনের রাজত্বকালে ভট্টিকাব্য রচিত হয় (পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী।)

অমিশ্র। ইহারা সম্ভবতঃ পূর্ব্ব দ্রাবিড়ীয়-গণেরই বংশধর, তাহাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তিত মাত্র। ইহারা স্বল্পভাষী এবং স্বল্প-সন্তুষ্ট; সৎ-চরিত্র, অতিথি-পরায়ণ ও শান্ত। ইহাদিগের সমাজে মিথ্যাবাদী ও চোর নাই। ইহারা অপর জাতীয় মানবকে ভয় করে, এবং পর্ব্বতকন্দরে অথবা সামান্য কুটীরে বাস করে। ইহারা পশুপক্ষী শিকার করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগের সমাজে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার প্রেতাত্মার উদ্দেশে *নৃত্যগীত হয়, এবং ভূতের ওঝা* † আসিয়া কোন কোন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। স্ত্রীজাতীয় ও পুং জাতীয় ভূতের নিকট ইহারা বলি দেয় এবং নৃত্যাদি করে।

ইহারা একবিবাহ পরায়ণ; এক সময়ে একটীর অধিক পতি অথবা পত্নীর সহিত মিলিত হয় না। ইহারা বহুসংখ্যক দলে বিভক্ত, কিন্তু কোন দলেরই রীতিমত দলপতি নাই।

দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বদ্রাবিড়ীয়গণ মধ্যে কেহ বা অতি অসভ্য জঙ্গলী, কেবল মাত্র শিকার করিতে জানে, কৃষি কার্য্য জানে না। কেহ বা কৃষীজীবী, কেহ শিল্পী এবং অপেক্ষাকৃত সভ্য। কেহ এক বিবাহ, কেহ বহু বিবাহ করিয়া থাকে।

বেদিয়াগণ সকল পদার্থের এক একটী আত্মা থাকা বিশ্বাস করে, ইহাদিগের মধ্যে যাহারা একটু উন্নত, তাহারা হিন্দু হইয়াছে।

দ্রাবিড়ীয়গণ। প্রথমেই একটী কথা বলা আবশ্যক। ইহাদিগের বংশানুক্রম, মঙ্গোলীয়গণের ন্যায় অত্যন্ত প্রবল। অর্থাৎ অন্য জাতীয় মানবের সহিত ইহারা সংগত হইয়া অপত্যোৎপাদন করিলে তাহার আকৃতি ইহাদিগের ন্যায়ই হয়। এ নিমিত্ত ইহারা অথবা ইহাদিগের বংশধরগণ অনেক স্থানেই লক্ষিত হয়; কিন্তু ইহারা প্রধানতঃ লঙ্কাদ্বীপ হইতে উত্তরে মধ্যভারত, উত্তর পশ্চিমে আবাবলী পর্ব্বত, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, উত্তর পূর্ব্বে রাজমহল, পূর্ব্বে আরব-সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বাস করে। ইহারা ককেশিয় ও মঙ্গোলীয়, উভয় শাখার সহিতই মিলিত হইয়াছে। যদিও ইহারা প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্য-বাসী, তথাপি পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ, এই ভূভাগেও ইহাদিগের বর্ণসঙ্কর অল্পাধিক *পরিমাণে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।*

পাঞ্জাব হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা সমস্ত ভূভাগে এক সম্প্রদায় প্রশস্ত-করোটী লোক দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে বিজ্‌লি সাহেব সিদিয়ান্ শাখাভুক্ত বিবেচনা করেন; কিন্তু ইহা সম্ভবতঃ ঠিক নহে। হেডেন ইহা-দিগকে এসিয়া খণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাংশস্থ পার্ব্বত্য জাতির একাংশ বিবেচনা করেন।

দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীয় জাতি মধ্যে মহারাষ্ট্রগণের সভ্যতা, বিদ্যাবত্তা, আচার ব্যবহার সমস্তই উন্নত, এবং হিন্দুধর্ম্মমূলক। ইহারা বোম্বাই প্রদেশে বাস করে। ইহাদিগের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহাদিগের দেশ-বাৎসল্য ও সমাজ-বন্ধন সুপ্রসিদ্ধ। প্রভু, কানারী এবং কুর্গদিগের সভ্যতা তাদৃশ উন্নত না হইলেও ইহারাও হিন্দু। ইহাদিগের ব্যবহার অনেকাংশে আমাদিগের ন্যায়। ইহারা মধ্যম করোটী, বুদ্ধিমান এবং স্বাধীন-চিত্ত, কিন্তু কিছু বিলাসী এবং আড়ম্বরপ্রিয়। ইহাদিগের মধ্যে বহু বিবাহ অল্প প্রচলিত, তালাক্ এবং বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত। ইহারা সাহসী ও যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল, কিন্তু এক্ষণে কলম অথবা লাঙ্গল চালাইতেছে!! প্রভু-দিগের কথা লিখিতে গিয়া পণ্ডিত হেডেন্

† Shaman

বোধ হয় একটু দীর্ঘনিশ্বাসের সহিতই লিখিয়াছেন, "The original occupation was that of the soldier, now they wield the pen." মহারাষ্ট্রগণ ব্যতীত অন্য সকলেই এতদূর আত্মসর্ব্বস্ব, অর্থাৎ অ-সামাজিক যে তাহারা রাষ্ট্রগঠন করিতে কখনই সক্ষম হয় নাই। যাহাদিগের সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা নাই, ব্যক্তিগত ভাবে জীবন যাপন করে, কিন্তু সম্মিলিত হইতে পারে না, যাহারা স্বত্ব প্রধান, সমাজের অধীনতা অথবা নেতার আনুগত্য করিতে অক্ষম, তাহারা রাষ্ট্রগঠন কার্য্যে সাধারণতঃ অক্ষম হইয়া থাকে।

দ্রাবিড়ীয়গণ মধ্যে তেলেগু, তামিল ও মলয়ালিম ভাষা ব্যবহারকারীগণ উল্লেখ যোগ্য। তেলেগু ভাষী ব্যক্তিগণ মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তর ভাগে বাস করে। ইহাদিগের সভ্যতাও উচ্চশ্রেণীর। ইহারা অধ্যবসায়ী, উৎসাহশীল ও বীর। ইহারা পূর্ব্বে অনেক বার রাষ্ট্রগঠন করিয়াছিল, এবং পূর্ব্ব সমুদ্রে ও সমুদ্রস্থ দ্বীপেও গতায়াত করিত, কখনও বা উপনিবেশ স্থাপনও করিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের উপনিবেশ স্থাপনের কীর্ত্তি শ্রীমান অক্ষয় কিছু কিছু কাড়িয়া লইয়া সম্প্রতি বাঙ্গালী জাতির খাতায় লিখিতেছেন। তাঁহার প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত যুক্তি অনেক আমি শুনিয়াছি। আমার বিশ্বাস তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একরূপ। যাহা হউক, এই অধ্যবসায়ী বীরের জাতি এক্ষণে বেশ নিরীহ এবং শান্ত হইয়াছে; কৃষিকার্য্য এবং দোকানদারী ভিন্ন অন্যদিকে বেশী ঝোঁক্ রাখে না।

তামিল-ভাষী ব্যক্তিগণ মান্দ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে বসতি করে। নায়ারদিগকে মালাবার অঞ্চলের শূদ্র জাতি বলা যায়। ইহারা স্নেহ-প্রবন, অতিথি-পরায়ণ, পরিশ্রমী, কিন্তু সভ্যতায় হীন, ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা সকলেই বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। ইহারা বীরের জাতি ছিল, কিন্তু এখন অবশ্য তাহা নাই। ইহাদিগের সমাজে অনেক সম্প্রদায় ভাগ আছে, সে সকল মধ্যে কন্যা আদান প্রদান হইতে পারে, নাও পারে। কিন্তু ইহাদিগের এক সম্প্রদায় মধ্যে উত্তরাধিকারীত্ব স্ত্রীলোক পরম্পরায় হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায় স্বদলে বিবাহ করিতে পারে না, অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে স্ত্রীগণ স্বামী-গৃহে বাস করে না, পিতৃ-গৃহে বাস করে। কিন্তু উত্তরাংশে স্বামী গৃহেই বাস করিয়া থাকে।

আমাদিগের মধ্যে যেমন পুরুষের তৃতীয় বিবাহ কলাগাছের সঙ্গে (নাম-মাত্র) হয়, নায়ার বালিকাদিগের তেমনই অতি অল্প বয়সে নামে মাত্র একটী বিবাহ হয়। পরে উপযুক্ত বর দেখিয়া বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদিগের পুরুষগণ এক পত্নীক, কিন্তু স্ত্রীগণ-মধ্যে বহু স্বামিত্ব দোষাবহ নহে। পূর্ব্বে ত একবারেই দোষাবহ ছিল না, কিন্তু এই প্রথা এখন ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে, ইহারা হিন্দু-ধর্ম্মের অনুগত স্তরে রহিয়াছে।

টোডাগণ বলবান, বুদ্ধিমান এবং প্রফুল্ল। ইহারা পশু পালন এবং দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখনাদির ব্যবসা করে। ইহাদিগের মধ্যে বহু স্বামিত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত, বহু পত্নীত্বও কম প্রচলিত নহে। ইহাদিগের উত্তরাধিকার পিতৃত্বমূলকও আছে, মাতৃত্বমূলকও আছে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে ঈশ্বর ইহাদিগের সমাজ মধ্যেই অবস্থিত করেন।

ছোটনাগপুরের মুণ্ডাভাষী ব্যক্তিগণ সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ীয়গণের এক শাখা। ইহা-

দিগের মধ্যে স্বদেশে বিবাহ নিষিদ্ধ। ইহারা সূর্য্য উপাসক।

দ্রাবিড়ীয়গণ প্রায় অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই বঙ্গদেশেরও নানাস্থানে, পর্ব্বতে অথবা জঙ্গলে, বাস করে। সাঁওতাল, আদি দ্রাবিড়ীয় জাতি। চামার, ডোম, বাবমাসিয়া* প্রভৃতিও বোধ হয় তাহাই। আমার বিশ্বাস চণ্ডালগণও তাহাই; কিন্তু এক্ষণে অন্য প্রকার মতও শুনা যাইতেছে। বাঙ্গালা ও মিথিলা দেশের অধিবাসীগণ মধ্যে পশ্চিমাংশের জনগণ আর্য্য দ্রাবিড়ীয় সংকর, পূর্ব্বাংশে তৎসহ মঙ্গোলিক রক্তও মিশ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গালার পশ্চিমাংশেও যে হয় নাই তাহা নহে, তবে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এই সকল প্রদেশের ব্যক্তিগণ কুণ্ডল-কেশ মধ্যে গণ্য নহে, ইহারা সরল-কেশ শ্রেণীভুক্ত।

দেখা গেল যে দ্রাবিড়ীয়গণ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, বঙ্গ বিহার ইত্যাদি বহু প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহারা মূলতঃ দাক্ষিণাত্য বাসী অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় দ্রাবিড়জাতি মূলতঃ দাক্ষিণাত্যেই চিরদিন বসবাস করিতেছে। তবে মানবজাতির দ্রাবিড়ীয় শাখা অন্যত্রও আছে, তাহা পরে বলিতেছি। ইহারা সভ্যতায় বহু প্রকার, কিন্তু ইহাদিগের ভাষা এক শ্রেণীর, তাহার সহিত অন্য কোন ভাষার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। ভারতীয়, অষ্ট্রেলীয়, এবং ইথিপিও দ্রাবিড়গণ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অন্যান্য দ্রাবিড়গণ নানা বর্ণের দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অষ্ট্রেলীয়গণ। ইহারা সম্ভবতঃ পূর্ব্ব-দ্রাবিড়ীয় বংশ। আকৃতি কিছু খর্ব্ব, নাশাপুট বিস্তৃত ও কিছু ব্যবধান; চোহালি বর্দ্ধিত। এই সকল লক্ষণ, (বিশেষতঃ বর্দ্ধিত চোহালি)† মানববিবর্ত্তনের অতি নিম্ন স্তরের। বর্ত্তমান অষ্ট্রেলীয় বর্ব্বর জাতি কুঞ্চিত-কেশ পাপুয়াম্ অথবা নিগ্রিটোগণের সহিত পূর্ব্ব দ্রাবিড়ীয়গণের সংমিশ্রন জাত। ইহারা মৎস্য মাংস কীট এবং উদ্ভিজ্জ আহার করে, কৃষি কার্য্য জানেনা কেবল পশ্চিমাংশবাসীগণ কিছু কিছু কৃষি কার্য্য আয়ত্ত করিয়াছে। ইহারা প্রধানতঃ শিকারী, কিন্তু একজনে যাহা শিকার করে তাহার ভাগ সকলকেই দিতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে অনেক বস্তু আহার করা নিষিদ্ধ। ইহারা নরমাংস খায়, কিন্তু কদাচিৎ। পশু পালন এখনও শিক্ষা করে নাই। দ্বীপের দক্ষিণাংশে লোমাবৃত পশু চর্ম্ম পরিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অন্যত্র কোনই পরিধেয় নাই। পত্র বল্কলাদি অলংকার রূপে ব্যবহৃত হয়, পরিধেয় রূপে নহে। ইহারা অঙ্গে ক্ষত চিহ্ন অলংকার স্বরূপ ব্যবহার করে। বৃক্ষশাখা, বৃক্ষত্বক্, ঘাস, কদাচিৎ কর্দ্দম সংযোগে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, উহা ক্ষুদ্র এবং নীচু। কাষ্ঠ প্রস্তর, অস্থি শম্বুক দ্বারা ইহারা অস্ত্র নির্ম্মাণ করে। লাঠি ও সড়কি এবং বুমারাং ইহাদিগের অস্ত্র। বুমারাং নিক্ষেপ করিলে, সুদর্শন চক্রের ন্যায় তাহা হাতে ঘুরিয়া আইসে। ইহারা এক কাঠের নৌকা প্রস্তুত করিতে পারে।

অষ্ট্রেলীয়ান্‌গণ বহু দলে বিভক্ত, প্রত্যেক দলের শিকারের স্থান এজমালী। প্রত্যেক দলের বীজ পুরুষ পৃথক, কিন্তু এক দলের অন্তর্গত সকলেরই বীজ পুরুষ এক। ইহাদিগের এক একটী দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে

* এই জাতি পূর্ব্ববঙ্গে বারমাস পুরুষানুক্রমে নৌকায় বাস করে। নানাবিধ ক্ষুদ্র দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে।

† Prognathous

বিভক্ত এই সকল সম্প্রদায়েও এজমালী শিক্ষার ক্ষেত্র আছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দলেরই এক একজন প্রবীণ বয়স্ক দলপতি থাকে। প্রত্যেক দলেরই পৃথক নাম আছে, উদ্ভিদ জন্তু অথবা অন্য কোন পদার্থের নাম হইতে ঐ নামকরণ হইয়াছে। ঐ সকল উদ্ভিদ জন্তু অথবা অন্য পদার্থ হইতে দলের সকলেই জাত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগের বিশ্বাস। এই হিসাবে দলের সকলেই নিকট সম্বন্ধ যুক্ত। যে দল যাহা হইতে জাত বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা শিকার করে না, ভক্ষণ করে না, এবং তাহাকে কোন প্রকারে বধ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করে না। স্বদলে বিবাহ নিষিদ্ধ, অন্য দল হইতে ইহারা বর অথবা কন্যা গ্রহণ করে। ইহাদিগের মধ্যে উত্তরাধিকার পিতৃত্বমূলক এবং মাতৃত্বমূলক, দুই প্রকারই আছে। কোন দলে ইহা মাতৃত্বমূলক, কোন দলে পিতৃত্বমূলক। বিবাহ যোগ্য বর অথবা কন্যার এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত স্বামী অথবা স্ত্রী; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐ বর অথবা কন্যা উভয়েই, অপরের স্ত্রী অথবা স্বামী স্বরূপে অস্থায়ী ভাবে থাকিতে পারে। কোন কোন দলে এই প্রথা উঠিয়া যাইতেছে।

প্রত্যেক দলেরই দলপতি আছে, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু আবশ্যক মত সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতি একত্র হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকে। দলপতিগণের মজলিসেরও এক জন সর্ব্বপ্রধান দলপতি থাকে।

শুভ প্রাপ্তি, এবং অশুভ নিবৃত্তির নিমিত্ত ইহারা তন্ত্র মন্ত্র ব্যবহার করে। ইহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তিনি আকাশে কোথাও আছেন এইরূপ বলে। তাঁহার তুষ্টির জন্য নানাবিধ জটিল ক্রিয়াকাণ্ড করে।

ইথিওপিয়ান্‌গণ। ইহাদিগের নিবাস আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্ব ভাগে। মিশরীয়গণ, বেজা, গালা, সোমালী, আবিসিনীয়গণ মানবজাতির এই শাখা ভুক্ত। ইহাদিগের সহিত আরবীয় সেমেটিক্ * জাতির এবং নিগ্রোদিগের বর্ণ সংকর হইয়াছে। ইহারা সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নহে, ঈষৎ লালাভ। মুখ লম্বা, কিন্তু চোহালি বর্দ্ধিত নহে। ইহাদের ওষ্ঠ পাত্‌লা, পুরু নহে। নাশা পুটদ্বয় ব্যবহিত আছে, অব্যবহিতও আছে। ইহারা আকৃতিতে কতকাংশে নিগ্রোদিগের ন্যায়, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে সরলকেশ ব্যক্তিও কম নাই। ইহারা সাহসী যুদ্ধ বিশারদ। ইহারা প্রধানতঃ মৎস্যাশী, এবং দীর্ঘ জীবী। ইহারা অসভ্য নহে। ইহাদিগের মধ্যে দলপতি অথবা রাজা মনোনীত করিবার প্রথা ছিল, কিন্তু মনোনীত হইলে পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ না করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না।

কুন্তল কেশগণের কৃষ্ণবর্ণ শাখা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ইহাদিগের কটাবর্ণ শাখা।

ইণ্ডো-আফ্‌গানজাতি। ইহারা মধ্যম আকৃতি, এবং দীর্ঘ কবোটী। ইহাদিগের মুখ লম্বা, দেহ সুগঠিত, নাসিকা সরল এবং উচ্চ; ইহারা দেখিতে সুশ্রী। রাজপুতগণ এই শাখার উৎকৃষ্ট বিবর্ত্তন। তাহারা দীর্ঘকায়। এই জাতি সভ্য। ইহাদিগের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

আরবীয়গণ। ইহারা মানব জাতির সেমেটিক্ শাখা ভুক্ত। ইহাদিগের কেশ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেহ ফর্সা। মুখ দীর্ঘ, অঙ্গ সুগঠিত, নাসিকা উচ্চ এবং তীক্ষ্ণ। ইহারা দেখিতে সুশ্রী। পূর্ব্বে ইহারা যজ্ঞদেব

* ইহুদীগণ এই শাখা ভুক্ত।

উপাসক ছিল, এক্ষণে মুসলমান হইয়াছে। ইহুদী জাতি এই শাখা ভুক্ত। ইহারা সুসভ্য। ইহাদিগের মধ্যে সংকর্য্য নাই বলিলেও হয়। ইহারা সাহসী এবং বাণিজ্য প্রিয়।

কুণ্ডলকেশগণের শ্বেত ও পীত শাখাস্থ নর্ডিক, আইনু এবং আল্প্‌স্ পর্ব্বতীয়গণ উল্লেখ যোগ্য।

নর্ডিকগণ। ইহাদিগেব দেহেব বর্ণ লাল মিশ্রিত শ্বেত; কিন্তু কেশের বর্ণ ঈষৎ লাল অথবা পীত, চক্ষুব তাবা সবুজ অথবা ধূসব। আকৃতি দীর্ঘ, মুখ লম্বা, নাসিকা দীর্ঘ, সবল ও উচ্চ। ইহাবা ইউবোপের নানাদেশে বর্ণ সংকব উৎপন্ন কবিয়াছে।

আইনুজাতি। ইহাবা জাপানেব আদিম অধিবাসী। ইষৎ স্থূল কায়, দৃঢ় ও বলবান। ইহাদিগের মস্তকে কেশ অধিক, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ এবং তরঙ্গায়িত। ইহাদিগেব মুখ প্রশস্ত চোহালি সম অর্থাৎ বর্দ্ধিত নহে, নাসিকা ক্ষুদ্র এবং প্রশস্ত। দেহ পীত, বর্ণ। ইহাদিগের চক্ষু বড় এবং সরল ভাবে স্থাপিত, মঙ্গোলীয়গণের ন্যায় বক্রভাবে স্থাপিত নহে। দেহ গঠন ইহারা সেমেটিক এবং দ্রাবিড়ীয় গণের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া আমার বিবেচনা হয়।

আল্প্‌স্ পর্ব্বতীয়গণ। এই শাখা ভুক্ত মানবগণ দ্বিবিধ, দীর্ঘ এবং খর্ব্ব। ইহারা হিমালয় পর্ব্বত হইতে সমসূত্রে পশ্চিমাভিমুখে এসিয়া মাইনব, বল্কান্ প্রদেশ, এবং ফ্রান্‌সেব মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বসবাস কবে। ইহাদিগেব মধ্যে যাহাবা অপেক্ষাকৃত উত্তরাংশে বাস কবে, তাহাবা ফর্সা এবং যাহাবা দক্ষিণংশে বাস কবে তাহাবা তত ফর্সা নহে, ববং কিছু কালই। ইউরোপের নানা প্রদেশে, এবং বস্তুতঃ ভারতবর্ষের আর্য্যজাতি মধ্যেও, ইহাদিগের বর্ণ সংকর আছে। ইহাদের মুখেব আকৃতি নানা প্রকার, দেহ গঠন স্থূল, চক্ষু কটা ও কাল দ্বিবিধই আছে। ইহাবা সুসভ্য। ইহাদেব বিশেষত্ব এই যে ইহাদিগেব বর্ণ, আকৃতি, উচ্চতা, প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট। কেবল কেশ কুণ্ডলিত অথবা তরঙ্গায়িত ভিন্ন অন্য প্রকার দেখা যায় না। শ্রীশশধব রায়।

বোম্বাই।

কলিকাতা হইতে বোম্বাই বেঙ্গল নাগপুর অথবা ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান বেলপথে যাইতে হয়। আমি উভয় পথেই গিয়াছি। দৃশ্য বৈচিত্রের কোন পথেই অভাব নাই। বেঙ্গল নাগপুর পথ মধ্য ভাবতের বিশাল অরণ্যানী সমাচ্ছন্ন গিরিমালা ভেদ করিয়া গিয়াছে বলিয়া পার্ব্বতীয় বন্য-দৃশ্যের প্রাচুর্য্যে আমার নিকট অধিকতক চিত্তাকর্ষক প্রতীয়মান হয়। উভয় পথই ভোশোয়ালে আসিয়া মিশিয়াছে। ভোশোয়ালের পর মর্ম্মাদ বড় ষ্টেশন। এইখান হইতে মান্দ্রাজ লাইন বাহির হইয়াছে। তাহার পর নাসিক। নাসিকের কয়েকটী ষ্টেশন পরেই ইগাৎপুরী। এইখান হইতে গাড়ী ঘাটগিরি পার হইতে আরম্ভ করে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে পশ্চিম ঘাটগিরি অবস্থিত। এই দুর্ভেদ্য গিরিমালা পার হইবার

জন্য কি অপরূপ কৌশলে রেলবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। গাড়ী পাহাড়ের গাত্র দিয়া সর্পগতিতে উঠিতে ও নামিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ইঞ্জিন পরিবর্ত্তনের জন্য রিভার্সিং (riversing) ষ্টেশন আছে। সেখান হইতে গাড়ী পশ্চাতে হটিয়া উঠিতে ও নামিতে আরম্ভ করে। স্থানে স্থানে পাহাড়ের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ (tunnel) প্রস্তুত করা হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে এইরূপ সতর আঠারটী টনেল পার হইতে হয়। টনেলের মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার। এইজন্য দিবাভাগেও গাড়ীতে আলোক দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। কোনও কোনও টনেলের মধ্যে অনবরত বৃষ্টির ন্যায় টিপ্ টিপ্ শব্দে জল পড়িতেছে। রেল পথের এক পার্শ্বে নিবিড় বিটপী সমাচ্ছন্ন অভ্রভেদী গিরিমালা, অপর দিকে ভীম-দর্শন গভীর গিরি-গহ্বর। কোথায়ও নির্ঝর ঝঙ্কৃত বনরাজী শ্যামল উপত্যকা, কোথায়ও বৃক্ষাদি বিরহিত বন্ধুর অধিত্যকা। কচিৎ দুরারোহ শৈল-শৃঙ্গোস্থিত ভগ্ন দুর্গ, কোথায়ও গিরি-পাদচুম্বি রজত সূত্রবৎ পর্ব্বত সরিৎ—প্রকৃতির এইরূপ দৃশ্যবৈচিত্র দেখিতে দেখিতে ঘাটগিরির খালঘাট অংশ পার হইয়া কল্যাণ জংসনে আসিতে হয়। এইখান হইতে পুনা লাইন দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে।

বোম্বাই একটী দ্বীপ। এই দ্বীপের সন্নিকট সালসিটী প্রভৃতি আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। রেলপথ ভারতের মূলভূমি হইতে সেতুযোগে প্রথমে একটী খাড়ি পার হইয়া সালিসিটি দ্বীপে ও তথা হইতে আর একটী খাড়ি পার হইয়া বোম্বাই দ্বীপে প্রবেশ করিয়াছে।

আমরা বোম্বাইয়ে জনৈক মারহাটি বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। বন্ধুটীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। গাড়ী বাইকুল্লা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে দেখিলাম, বন্ধুর ভ্রাতা আমাদের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা বাইকুল্লা নামিয়া গাড়ী করিয়া বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমাদের বন্ধুর ভ্রাতা তথাকার কোন মিলের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। তাঁহার বাড়ী পল্লীগ্রামে, কার্য্যব্যাপদেশে সপরিবারে এখানে বাস করিতেছেন। একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার ত্রিতলে তিনটী কক্ষ ও একটী বারাণ্ডা লইয়া তাঁহার বাসা। বোম্বাইয়ে বাড়ী ভাড়া অত্যন্ত বেশী। এজন্য অনেকেই এক বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ ভাড়া লইয়া বাস করেন। বাংলার মত এখানে অবরোধ প্রথা প্রচলিত নাই বলিয়াই অপরিচিত বহু পরিবারের এক সঙ্গে বাস করার কোন অসুবিধা হয় না। আমাদের বন্ধুর ভ্রাতার পরিবার মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, একটী এগার বার বৎসরের কন্যা ও একটী শিশু কন্যা মাত্র দেখিলাম। আমরা তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হওয়া মাত্র সকলে আহ্লাদের সহিত আমাদের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। দয়াময়ের কৃপায় এই সুদূর প্রবাসেও আমাদের জন্য এত আদর এত যত্ন অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি আমাদের জন্য সকল সময় সকল অবস্থায় কৃপার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিনা। আমরা ক্ষণেক বিশ্রামান্তে খাইতে বসিলাম। বাড়ীর গৃহিনী আমাদের জন্য যে কত প্রকারের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। দুই প্রকার পলায় নানাবিধ নিরামিষ ও মাংসের ব্যঞ্জন, ও নানা প্রকার রসনাতৃপ্তিকর সন্দেশ ও পিষ্টকাদি এত রকমের প্রস্তুত হইয়াছিল যে

অল্প অল্প পরিমাণে খাইলেও উদরে স্থান সঙ্কুলান হয় না। এদেশে আহারান্তে ফলাহারের নিয়ম আছে। এইরূপ ভোজনের পর আবার ফলাহারের জন্য আদর অনুরোধ আমাদের নিকট অত্যাচার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বাটীর কর্ত্তা গৃহিনী ও তাঁহাদের বালিকা কন্যাটীর আদর আপ্যায়নে পরম প্রীত হইয়া আমরা আহারান্তে যথা-নির্দ্দিষ্ট গৃহে শয়ন করিলাম। বোম্বায়ে এত শীত কম যে পৌষ মাসেও রাত্রে লেপের পরিবর্ত্তে একখানি আলোয়ানই যথেষ্ট মনে হইয়াছিল।

পরদিবস প্রাতরাশ সমাপনান্তে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। বোম্বাইও কলিকাতার ন্যায় জনাকীর্ণ। রাজপথ গুলি প্রশস্ত ও পরিষ্কার। কলিকাতার উত্তরাংশের ন্যায় অপরিসর ও অপরিষ্কার রাস্তা এখানে অতি অল্পই আছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাটী গুলি ৫।৬ তালা উচ্চ। চার তালার নিম্নে বাটী নাই বলিলেই হয়। বোম্বাই নগরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান গুলির বিবরণ দিবার পূর্ব্বে এই নগরের একটী মোটামুটী পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

কলিকাতার পরই বোম্বাইয়ের ন্যায় সুন্দর নগরী ভারতে আর নাই। কোন কোন বিষয়ে বোম্বাই কলিকাতা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে হয়। ইহা সমুদ্র বেষ্টিত দ্বীপ, এজন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কলিকাতা হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। কলিকাতা সুরম্য প্রাসাদাবলীর নিকেতন (city of palaces) হইলেও বোম্বাই সমগ্র ভারতবর্ষে (city of beauty) সৌন্দর্য্য গরিমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার ন্যায় বোম্বাইও ইংরাজের সৃষ্ট, ইংরাজের কীর্ত্তি। খ্রীষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই নগরের অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ। পঞ্চদশ শতাব্দের প্রথমে এইস্থানে পর্ত্তুগীজদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। সে সময় বোম্বাই দ্বীপ অতি অস্বাস্থ্যকর জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ধীবর ও জলদস্যু ভিন্ন তখন এখানে কেহ বাস করিত না। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ এই অকিঞ্চিৎকর স্থানের কোন মূল্য আছে বলিয়াই মনে করিতেন না। তজ্জন্য মুষ্টিমেয় বিদেশী বণিকগণ অবলীলাক্রমে ইহা অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। সে সময় ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাগণের নিকট সমুদ্র পথের বড় গৌরব ছিল না। অতি প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধ যুগ পর্য্যন্ত ভারতের অর্ণবপোত নানাদেশে বাণিজ্য সম্ভার লইয়া যাতায়াত করিত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধ-যুগ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য লোপ হইয়া আইসে। আমরা পর্ত্তুগীজদিগের ভারতে শুভাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখিতে পাই যে ভারতের পণ্যদ্রব্য হিন্দুকুশ পার হইয়া কাবুল ও পারস্য দিয়া মিশরে নীত হইত ও তথা হইতে ভিনিসীয় বণিকগণ ইওরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাইত। পর্ত্তুগীজরা যখন এই দ্বীপ অধিকার করেন তখন এখানে একমাত্র জলদস্যুগণের আবাসস্থান ছিল। বা লায় বোম্বেটে বলিয়া যে গ্রাম্য-শব্দ প্রচলিত আছে উহা বোম্বাইটের (Bombite) অপভ্রংশ, সম্ভবতঃ আদিম বোম্বাইবাসীগণের (Bombites) উচ্ছৃঙ্খল দস্যু-প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

পর্ত্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারাইনের সহিত ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ উপলক্ষে পর্ত্তুগীজরাজ এই অকিঞ্চিৎকর বোম্বাই দ্বীপ

যৌতুক স্বরূপ ইংলণ্ডেশ্বরকে প্রদান করেন। ইংরাজরাজ ইহা ইংরেজ কোম্পানীকে বার্ষিক দশ পাউণ্ড কর বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সেই হইতে বোম্বাই ইংরেজ অধিকার ভুক্ত হইয়া আছে। মুসলমানগণের সময়ে সুবাট ভারতবর্ষের প্রধান বন্দর ছিল। এই জন্য নানাদেশীয় ব্যক্তিগণ সুবাটেই প্রথমে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দের পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠনে ও মুসলমান প্রাধান্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুবাটেও ভাগ্যলক্ষ্মীর পতন আরম্ভ হয়। তখন ইংরেজ কোম্পানী সাগরবেষ্টিত বোম্বাই দ্বীপ অধিকতর নিরাপদ মনে করিয়া এই স্থানেই তাঁহাদের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন ও ন্যূনাধিক শত বৎসরের মধ্যে বোম্বাই জলাজঙ্গলপূর্ণ বসতিশূন্য অস্বাস্থ্য কর দ্বীপের স্থলে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ন্যায় ইংরাজের যাদু মন্ত্রের স্পর্শে কবি-সৃষ্ট অমরাবতীকে পরাস্ত করিয়াছে।

বোম্বাইর প্রাচীন নাম মুম্বই। মুম্বই নাম্নী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম হইতে মুম্বই নাম। ও তাহার অপভ্রংশে বোম্বাই নামকরণ হইয়াছে। এখনও মুম্বই দেবীর মন্দির বোম্বাইএ বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ বলেন (Bombahia) শব্দে পর্টুগীজ ভাষায় উৎকৃষ্ট বন্দর বুঝায়, তাহারি অপভ্রংশে বোম্বাই নামের উদ্ভব হইয়াছে।

বোম্বাই একটী দ্বীপ, উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। এই দ্বীপও ভারতের মূল ভূমির মধ্যে গভীর সমুদ্রশাখা বর্ত্তমান থাকায় ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইয়াছে। এই সাগরাংশে এলিফাণ্টা প্রভৃতি কয়েকটী দ্বীপ আছে। বোম্বায়ের পশ্চিমাংশে সুপ্রসিদ্ধ মালাবার হিল লম্বালম্বি ভাবে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণাংশে মালাবার পয়েণ্টে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের রাজপ্রাসাদ। মালাবার পয়েণ্টের পূর্ব্ব হইতে বোম্বায়ের সর্ব্ব দক্ষিণ সীমানা কোলাবা পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিতে অবস্থিত সাগরাংশ ব্যাক্ বে (Back Bay) নামে অভিহিত। এই দ্বীপের মধ্য দিয়া গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার ও বোম্বে বরদা রেল পথ উত্তর হইতে দক্ষিণ সীমানা পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ ও কোলাবা ষ্টেশনদ্বয় যথাক্রমে উভয় রেলের শেষ ও প্রধান ষ্টেশন। বোম্বায়ের দৃশ্যগুলির মধ্যে অ্যাপেলো বন্দর, ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন, রাজাবাই টাওয়ার, ইউনিভার্সিটি হল, ক্রফোর্ড মার্কেট, মালাবার হিল, মিউজিয়াম, পশুশালা, এলিফ্যাণ্টা, কেভ্স্, ফোর্ট, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি, হাইকোর্ট, পোষ্টাপিস, টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতি প্রধান।

আমরা প্রাতে ট্রামে উঠিয়া বোম্বাই সহরের একটা মোটামুটি দৃশ্য প্রথমে দেখিলাম। পরে একটি কাপড়ের কল, রাজাবাই টাওয়ার ও ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ ষ্টেশন দেখিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

বোম্বাই নগরে প্রায় শতাধিক সুতা ও কাপড়ের কল আছে। একটী একটী কলের মূলধন ৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ পর্য্যন্ত। তন্মধ্যে টাটার স্বদেশী মিল, সেমুন মিল, ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিল, গ্লোব মিল, পোটিট মিল, প্রভৃতি প্রধান। অধিকাংশ মিলই স্বদেশী মূলধনে দেশীয় গণের দ্বারা পরিচালিত। বোম্বাই প্রদেশের পারসীক ও গুজরাটীদের ন্যায় বাণিজ্যোৎসাহী জাতি ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নাই। এইজন্য ইঁহাদের অধিকাংশই বিপুল বিত্ত সম্পন্ন। এপ্রকার অধিকাংশ মিলের সত্বাধিকারী পারসীক ও গুজরাটী। আমরা বাঙ্গালী চাকরীজীবী, চাকরী ভিন্ন কিছুই

বুঝিনা, এইজন্য বাঙ্গালার বার আনা ব্যক্তি নিঃস্ব বা নিরন্ন। সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত থাকায় কতক ঘর জমিদার বাঙ্গালার ধনগৌরবের পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে ব্যবসায়ে অর্থনিয়োগ অপেক্ষা, জমিদারী ক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে আলস্যে কালযাপন বাঙ্গালী অধিকতর নিরাপদ মনে করে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" একথা বাঙ্গালীর নিকট কেবল প্রবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, কয়েক বৎসর স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ব্যবসা বাণিজ্যের চেষ্টার উন্মেষ হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালায় কয়েকটী কাপড়ের কল, ও অন্যান্য যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যবসা বাণিজ্যে অনভিজ্ঞতা বশতঃ বঙ্গবাসীগণ এ পর্য্যন্ত এদিকে বিশেষ উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই। আমরা ৫ বৎসর হইল আঠার লক্ষ টাকা মূলধনে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল স্থাপন করিয়া এ পর্য্যন্ত লাভ দেখাইতে পারি নাই। অথচ বোম্বাই ও আমেদাবাদে তাহার অনেক পরে কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়া লাভ দিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা কি বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা নহে?

বাজা-বাই টাওয়ার।—বাজাবাই নাম্নী জনৈক পার্শী মহিলার অর্থে প্রস্তুত। এই সুবিখ্যাত স্তম্ভ ২৬০ ফিট উচ্চ, আট তালা। ইহার উপর হইতে বোম্বাই নগরীর দৃশ্য পরম রমণীয় দেখায়। এই স্তম্ভের উপর উঠিতে পাসের দরকার হয়। পূর্ব্বে বিনা পাসেই উঠা যাইত। কিন্তু ইহার উপর হইতে নিম্নে নিক্ষেপিত হইয়া দুইটী পার্শী রমণীর হত্যাকাণ্ড সাধনের পর হইতে বিনা পাসে টাওয়ারে উঠা নিবারিত হইয়াছে।

আমরা রাজা-বাই টাওয়ার হইতে মিউনিসিপাল আপিস, হাইকোর্ট, টেলিগ্রাম আপিস ও জেনারেল পোষ্ট আপিস দেখিয়া ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে উপস্থিত হইলাম। উল্লিখিত আপিস গুলির সমুন্নত সৌধমালা দেখিতে পরম সুন্দর (picturesque)

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস।—ভারতবর্ষে এমন সুন্দর রেলষ্টেশন আর নাই। শুনিয়াছি, পৃথিবীর মধ্যেও এমন সুন্দর ষ্টেশন অতি বিরল। ইহার মধ্যবর্ত্তী সুবৃহৎ কক্ষের উপরিস্থিত গম্বুজ অতি উচ্চ ও নানা প্রকার রঙ্গিন প্রস্তরের কারুকার্য্যখচিত। এই প্রকাণ্ড কক্ষের ভিত্তি গাত্র ও কুট্টিমদেশ সমস্তই মর্ম্মর মণ্ডিত ও নানা প্রকার মূল্যবান প্রস্তরের কারুকার্য্যে উৎখচিত। এই ষ্টেশনের প্রত্যেক লাইনের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যাত্রীদের গাড়ীতে উঠিতে কোন অসুবিধা হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ ও দ্বার রক্ষকের তাড়নার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। আমরা এথা হইতে রেলে উঠিয়া আমাদের বাসার সন্নিকট চিন্‌পুক্‌লী ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে পনর মিনিট অন্তর অন্তর লোকাল ট্রেণ ছাড়িয়া থাকে। এজন্য সহরের মধ্যে এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইতে রেলপথেই লোকের বিশেষ সুবিধা।

আমরা আহারান্তে এলিফ্যাণ্টা কেভ্‌স্‌ (হস্তী গুম্ফা) দেখিবার জন্য রেলপথে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া তথা হইতে ট্রাম যোগে এপোলো বন্দরে উপস্থিত হইলাম।

এপোলোবন্দর পৃথিবীর মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ পোতাধিষ্ঠান। এই স্থানে অর্দ্ধচন্দ্রা-

কৃতি সমুদ্র বক্ষে বিশাল জলভাগ অধিকৃত করিয়া অবস্থিত নানা দেশীয় অর্ণবপোত সমূহের বিচিত্র সমাবেশ দেখিলে প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়। এই স্থানে আসিলে মনে হয়, সম্মুখে পৃথিবীর একটী ক্ষুদ্র আদর্শ বিরাজিত। পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের লোক বাণিজ্য ব্যপদেশে এখানে উপস্থিত আছে। শ্বেতকায় ইউরোপীয় হইতে আফ্রিকার কৃষ্ণ-বর্ণ কাফি, দীর্ঘাকার আফগান হইতে খর্ব্বাকার জাপানী, ইরানী, তুরানী, চীনা, আর্মানী, ইহুদী, জার্ম্মান, আরবী, অষ্ট্রেলিয়ান, রুষ, ফরাসী, মার্কিন, হাবসী, সর্ব্ব দেশীয় লোক একস্থানে দৃষ্ট হয়। সাগর-বক্ষে নানা দেশীয় পোতমালা নিজ নিজ জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে। অগণিত জনস্রোত সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়াছে, বিরাম নাই। এমন জাগ্রত সজীবভাব আমি ভারতে আর কোথাও দেখি নাই। এইখানে প্রাচ্য-সুলভ উদ্যমহীন জাতীয় জীবনের জড়তা বিদূরিত হইয়া পাশ্চাত্য জগতের সজীব স্পন্দনতার সূত্রপাত হইয়াছে—বোধ-হয় এইজন্য এই স্থানকে "Gate of the West" পাশ্চাত্য জগতের প্রবেশ-দ্বার বলা হইয়া থাকে।

আমরা এপোলো বন্দরে উপস্থিত হইয়া দেখি, এলিফাণ্টাগামী ষ্টীমার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ছাড়িয়া গিয়াছে, আর যাতায়াতের ষ্টীমার নাই। আমরা বাধ্য হইয়া চারি টাকায় একখানি যাতায়াতের নৌকা ভাড়া করিলাম। এলিফ্যাণ্টা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। বোম্বাই হইতে সাত মাইল দূরে। সে দিবস সমুদ্রের জল অতি ধীর স্থির, তরঙ্গ ভঙ্গের লেশ মাত্র ছিল না। এইরূপ নিস্পন্দ জলরাশির স্বচ্ছ দর্পনবৎ প্রতিকৃতি দেখিয়া নৌকায় যাইতে আমাদের মনে সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। সমুদ্রের জল সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ ও রৌদ্রের সময় গাঢ় নীল বর্ণ দেখায়, কিন্তু বোম্বাইয়ের উপকূলে সাগর-বারি পীতাভ বলিয়া বোধ হইল। ছোটবড় অসংখ্য অর্ণবপোত সমূহের পার্শ্ব দিয়া আমাদের ক্ষুদ্র তরীখানি দাঁড় বাহিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল ও পোতমালা অতিক্রম করতঃ মুক্ত সমুদ্রে পড়িয়া দুইটী মাস্তুলে দুইখানি পাল তুলিয়া দিল। তখন তরীখানি পালভরে ঈষদান্দোলিত সাগর-তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। আমরা দূর হইতে প্রংস্ লাইট হাউসের স্তম্ভ দেখিলাম। এই আলোক স্তম্ভ ১৬৮ ফিট উচ্চ, এগার তালা। এত উচ্চ আলোক-স্তম্ভ ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নাই। ইহার আবর্ত্তনশীল আলোক বিশ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এলিফ্যাণ্টা যাইতে পথে আরও দুই একটী দ্বীপ দৃষ্ট হয়, ইহাতে বারুদাগার (magazine) প্রভৃতি অবস্থিত আছে। আমরা প্রায় ১টার সময় নৌকা ছাড়িয়া অপরাহ্ণ ৩টার সময় এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে উপনীত হইলাম। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে দ্বীপে উঠিবার জন্য পাথরের সিড়ি বাঁধা আছে। গভীর তরঙ্গাভিনয় তেমন উপলব্ধি হয় না, কিন্তু কূলে তরঙ্গ-ভেদ-জনিত জলোচ্ছ্বাসে আমাদিগকে তরী হইতে নামিবার সময় অর্দ্ধার্দ্র হইতে হইয়াছিল। সিঁড়ি দিয়া দ্বীপে উঠিতে পা ধরিয়া আইসে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম না করিয়া উঠা কষ্টকর। অনেক দুর্ব্বল পুরুষ ও মহিলাগণ বাহকের স্কন্ধে চেয়ারে করিয়া উপরে উঠিতেছেন, দেখিলাম। আমাদের উঠিতে মধ্য পথে একবার বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। গুহার

দ্বারদেশে একজন ইউরোপীয় মহিলা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে দুই আনা করিয়া টোল আদায় করিতেছেন। এই আয়ের দ্বারা গুহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

একটী পাহাড় খোদিত করিয়া এই গুহাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড হস্তীমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, তাহাতেই হস্তীগুম্‌কা নাম হইয়াছে। এখন আর সে হস্তীমূর্ত্তি এখানে নাই। তাহার ভগ্নাবশেষ বোম্বাই ভিক্টোরিয়া উদ্যানস্থিত মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। প্রবেশ-দ্বার পার হইলে সম্মুখে একটী সুবিস্তৃত কক্ষ। কক্ষটী প্রায় ষাইট হস্ত সমচতুষ্কোণ হইবে। উহা বিয়াল্লিশটী স্তম্ভের উপর অবস্থিত। স্তম্ভগুলির গাত্রে নানা দেবদেবীর ও স্ত্রী পুরুষের মূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিগুলি অনেক স্থলে ভাঙ্গিয়া বিকৃতাঙ্গ হইয়াছে। কক্ষের ভিত্তি গাত্রে তিনটী দেব মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম, মধ্যেরটী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ত্রি মূর্ত্তি। দক্ষিণে বৃষভবাহন হরপার্ব্বতী-মূর্ত্তি, বামে অর্দ্ধনারী অর্দ্ধপুরুষ রূপিণী হরপার্ব্বতীর যুগলমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি প্রায় ৫।৬ হাতের কম উচ্চ হইবে না। এতদ্ব্যতীত চারি পার্শ্বের ভিত্তি গাত্রে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। কিন্তু কাল প্রভাবে প্রায় সকলগুলিই অল্পবিস্তর বিকৃতাঙ্গ হইয়াছে।

এই সুবৃহৎ কক্ষটীর চারিদিকে আরও চারিটী ক্ষুদ্র কক্ষ আছে। তাহার একটীতে হরপার্ব্বতীর বিবাহ দৃশ্য, একটীতে লম্বোদর গজানন গণেশের মূর্ত্তি, একটীতে দশানন কর্ত্তৃক কৈলাসপর্ব্বত উত্তোলনের প্রয়াস দৃশ্য, ও অপরটীতে দুইটী শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইলাম। এই সকল কক্ষ, স্তম্ভ ও মূর্ত্তি, একটী অখণ্ড পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই বিরাট ব্যাপার কত পরিশ্রম, কত সময়, কত অর্থব্যয় সাপেক্ষ, তাহা মনেও ধারণা হয় না। যে সময় এই গুহাগুলি প্রস্তুত হইয়াছে, সে সময় বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয় নাই। সেকালের সেই মোটামুটি হাতুড়ি বাটালি ও সাবলের সাহায্যে কি প্রকারে এই বিরাট ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

আমরা বড়দিনে এই গুহা দেখিতে যাই। সেদিবস অনেক ইংরাজ ও পারসিক নরনারীর শুভাগমনে ক্ষুদ্র দ্বীপটী পুলকিত হইয়াছিল। আমরা গিয়া দেখি, মধ্যবর্ত্তী সুবৃহৎ কক্ষটী ইংরাজ নরনারী দ্বারা অধ্যুষিত ভাবটী যেন মূর্ত্তি গুলির মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে। আমরা সভয়ে তাহাদের পাশ দিয়া কক্ষটী ঘুরিয়া দেখিলাম। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র বিচলিত বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিল না। তাঁহারা নৃত্য ব্যাপারে এতই বিভোর হইয়াছিলেন যে, আমাদের প্রবেশ ও পরিক্রম বোধ হয় তাঁহাদের লক্ষীভূত হয় নাই। আমরা কক্ষগুলির পরিদর্শনান্তে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের আনন্দ দেখিতে লাগিলাম। ইংরাজের একটী জাতীয় গুণ যে যখন তাঁহারা কোন কার্য্য করেন, তখন তাহা তন্ময় হইয়া সম্পন্ন করেন। আবার যখন তাঁহারা কোনরূপ আমোদে মত্ত হন, তাহাতেও তাঁহাদের জাতীয় ভাব সেই তন্ময়তা বিদ্যমান থাকে। আমরা ভিন্ন জাতি ধৃতি চাদর পর নেটিব, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের আমোদ উপভোগ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে লজ্জা বা সঙ্কোচ দূরে থাক, বোধ হয়, আমাদের সেখানে অবস্থিতিও তাঁহাদের গ্রাহ্যের মধ্যে স্থান পায় নাই। তাঁহাদের এই আনন্দের মত্ততায়

আমরা যথেষ্ট প্রীতি অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের দেশীয় নাচ কুরুচির পরিচায়ক বলিয়া ইউরোপীয় সমাজে নিন্দিত। কিন্তু ইহাদিগের যে যুগল নৃত্য দেখিলাম, তাহা কি প্রকারে মার্জ্জিত সুরুচির অনুমোদিত, তাহা বুঝিতে পারি না। এক একজন পুরুষ এক একজন ঈষদুন্নেষিত পীনবক্ষ রমণীর ক্ষীণ কটি এক হস্তে ধরিয়া যুগলরূপে যে প্রকার নৃত্য কলার অভিনয় করিতেছেন, তাহাই যদি সুরুচিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে "ভিন্ন রুচির্হি মানবঃ।"

এই গুহা কোন্ সময় খোদিত করা হইয়াছে, তাহা নির্ণীত করা কঠিন। তবে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ ইহা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কোন হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, অনুমান করেন। নাসিকের পাণ্ডব গুহা বা সুপ্রসিদ্ধ কার্লিকেভস আমার নিকট বৌদ্ধ কীর্ত্তি বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। কিন্তু এই হস্তিস্তম্ভ দেখিলে ইহা হিন্দুদিগের নির্ম্মিত বলিয়াই বিশ্বাস হয়। আমরা গুহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বতশীর্ষে আরোহণ করিলাম। এলিফ্যাণ্টা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহার পরিধি ৫ মাইলের অধিক নহে। পর্ব্বত-শীর্ষ হইতে একযোগে দ্বীপের চতুর্দ্দিক নয়নগোচর হয়, দ্বীপটী পর্ব্বতময়। মনে হয়, সমুদ্র গর্ভ হইতে একটী গিরিশৃঙ্গ উঠিয়া এই দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। আমরা সেই শৃঙ্গোপরি উপবেশন করিয়া পাদমূলে তরঙ্গ-ভঙ্গের অবিরাম ক্রীড়া ও তদুপরি প্রতিবিম্বিত অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণ ছটার অপূর্ব্ব সুষমা দেখিতে দেখিতে এতই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ফিরিবার কথা আদৌ মনে স্থান পায় নাই। শেষে নীলাম্বু-চুম্বি চক্রবাক-ক্রোড়ে অস্তগমনোন্মুখ হেমপিণ্ডনিভ দিনমণির ক্রমাবতরণ দৃষ্টে আমরাও ত্বরিত-পদে পর্ব্বতশীর্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তরী আরোহণ করিলাম।

ধীরে ধীরে অস্তমিত সূর্য্যের লোহিত কিরণ রেখা গগনপটে মিলাইয়া সন্ধ্যার শান্ত শোভা বিষদন্তে ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে নক্ষত্র বালাগণ অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে আরম্ভ করিল। স্বয়ং শশধর পূর্ণ কলেবর হইয়া রজত শুভ্র কিরণ জালে সমুদ্র-বক্ষ ও নভোমণ্ডল বিভাসিত করিয়া তুলিলেন। যেন বোধ হইল, একখানি সুধাধবলিত স্বচ্ছ বিতান-পট নীলাম্বু-বক্ষে প্রসারিত হইল। সেই শান্ত মধুর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সুষুপ্ত সমুদ্র বক্ষে সান্ধ্য-হিল্লোলান্দোলিত তরঙ্গ তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে দুইখানি পাইল তরী ক্ষুদ্র তরী ছুটিয়া চলিল। অদূরে পূর্ব্বভাগে অগণিত দীপালোকোদ্ভাসিত বোম্বাই নগরী যেন অলোক-সাধারণ কোন স্বপ্নদৃষ্ট অপূর্ব্ব স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তরঙ্গ-প্রতিহত নৌকা বাহক সঙ্গীত-লহরী শুনিতে শুনিতে, আমরা সুকণ্ঠ না হইলেও, তন্ময় হইয়া সে সুরে সুর মিশাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। দেখিতে দেখিতে তরী আসিয়া বন্দরে উপনীত হইল। আমাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, যেন এতক্ষণ আমরা কোন স্বপ্নদৃষ্ট অপূর্ব্ব স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম। কি যেন অলৌকিক সৌন্দর্য্য মধ্যে ডুবিয়াছিলাম কি যেন অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতলহরী শুনিতেছিলাম। আমরা তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তরী হইতে অবতরণ করিলাম।

তীরে অবতরণ করিয়া "দীপাবলীতেজে" উজ্জ্বলিত" অ্যাপেলো বন্দর হইতে পদব্রজে ক্রফোর্ড মার্কেট অভিমুখে গমন করিলাম।

কিন্তু

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ্
সংযতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং
নীয়মানস্য॥"

বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত ফলমূল ও বিবিধ পণ্য-সম্ভাবে সুসজ্জিত বিপণিমালা-পরিশোভিত এই মিউনিসিপাল বাজারটী আমাদের নিকট অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। এখানে ফলমূল ও মাংস একই বেষ্টনী মধ্যে বিক্রীত হয় না। মাছ মাংসের জন্য স্বতন্ত্র আবৃত স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। ফলের বাজারে নানাবিধ ফলের দোকান দেখিলাম। পৌষ মাসেও ক্ষুদ্র কুড়ি হইতে সুপক্ক আম্র পর্য্যন্ত সকল প্রকার পর্য্যায়ের আম্র যথেষ্ট সজ্জিত দেখিলাম। ফুল ও ফুলের অলঙ্কারের দোকানে রূপের বাজার লাগিয়াছে; ইহাতে এতদ্দেশীয় রমণীবৃন্দের ফুলের অলঙ্কার-প্রিয়তার লক্ষণ বুঝিলাম। আমরা ফুলের দোকান হইতে কয়েক প্রকার অলঙ্কার ক্রয় করিয়া ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে আসিলাম, ও তথা হইতে ট্রেনে উঠিয়া বাসায় উপনীত হইলাম। আজ রাত্রেই আমাদের পুনা রওয়ানা হইবার কথা। এজন্য দেখিলাম, বাটীর গৃহিণী আমাদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিয়া আছেন। আমরা তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করতঃ আমাদিগের আনীত ফুলের অলঙ্কারগুলি উপহার প্রদান করিয়া, সেই মারহাট্টি পরিবারের নিকট ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। সেই মারহাট্টি পরিবারের বিনয় ও আথিতেয়তা ও কিশোরী বালিকার তরুণ হৃদয়ের সরলতা-মাখা আদর এজীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

আমরা পুনা হইতে পুনরায় বোম্বাই আসি। পুনরায় মারহাট্টী বন্ধুর গৃহে গিয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে ইচ্ছুক না হইয়া, "নারায়ণ ভোজন বস্তী গৃহ" নামক হোটেলে উপস্থিত হইলাম। বড় রাস্তার ধারে একটী চাবিতালা বাটীতে এই হোটেল অবস্থিত। বাটীর সর্ব্বনিম্নতলে নানাবিধ দোকান, মধ্যে দুইটী তলে হোটেল ও সর্ব্বোচ্চতলে হোটেলের অধিকারী সপরিবারে বাস করেন। হোটেলের তিনটী শ্রেণী আছে। তৃতীয় শ্রেণীতে খাবার ও থাকিবার জন্য দৈনিক জনপ্রতি একটাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুইটাকা ও প্রথম শ্রেণীতে তিন টাকা। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়া ত্রিতলে একটী সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে আশ্রয় পাইলাম। বোম্বাই অঞ্চলে সচরাচর নারিকেল তৈলে ব্যঞ্জনাদি পাক করা হয়। আমরা আমাদের খাবার নারিকেল তৈলে পাক করিতে নিষেধ করি। তাহার ফলে, নারিকেল তৈলের পরিবর্ত্তে প্রথম বেলা অলিভ অয়েলে (Olive oil) পাক করা ব্যঞ্জনাদি খাইতে হইয়াছিল। ভবিষ্যতে আমাদের খাদ্য দ্রব্য সর্ষপ তৈলের অভাবে ঘৃতপক্ক করিতে আদেশ করি। সেজন্য আমাদিগকে চারিজনে দৈনিক আট আনা অতিরিক্ত দিতে হইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যের উপকরণ, আতপ চাউলের অন্ন, ঘৃত, ২।১টা তরকারী, অড়হরের দাউল ও ২।১ প্রকার চাটনী মাত্র। রাত্রে ইচ্ছা করিলে অন্নের পরিবর্ত্তে মোটা রুটী পাওয়া যায়। ইহার উপর মাছ মাংস খাইতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়। আমাদিগকে সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক মৎস্য পমফ্রেড্ (pumfred fish) খাইবার জন্য প্রতিজনে ॥০ আনা অতিরিক্ত দিতে হইয়াছিল। কিন্তু

যতই অতিরিক্ত দেওয়া হউক না কেন, এই হোটেলের কাছাদেওয়া পাচিকাগণের প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদির যে কোনকালেও বাঙ্গালীর রসনার সহিত সম্প্রীতি হইতে পারে, এমন মনে হয় না। আমাদের ইহার উপর বাধ্য হইয়া প্রতিদিন প্রাতে দধি ও চিনি এবং রাত্রে রাবড়ি ও প্যাড়া নগদ মূল্যে ক্রয় করিয়া জঠরানল নিবৃত্তি করিতে হইত। ইতিহাসে বর্গিদের লুণ্ঠনপ্রিয়তার বিষয় পড়া ছিল, কিন্তু এতদিন তাহার কোন পরিচয় পাই নাই। এই হোটেলেই তাহাদের সেই তথাকথিত জাতীয় চরিত্রের প্রথম পরিচয় দেখিলাম। আমরা এই যাত্রায় বোম্বাইয়ের অন্য অন্য দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দর্শন করি।

মালাবার হিল।—বোম্বাইয়ের মালাবার হিলের ন্যায় সুন্দর স্থান আর নাই। ইহার পশ্চিমে উত্তাল তরঙ্গমালা-সঙ্কুল আরব সাগর। পাহাড়ের গাত্রে স্তরে স্তরে রাজপথ ও তৎপার্শ্বে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও সুরম্য উদ্যানমালা শোভা পাইতেছে। এইখানে যত বড় ইংরেজ, পার্শী ও গুজরাটী সওদাগরদিগের বাটী। ইহার শেষ সীমায় লাট সাহেবের ভবন অবস্থিত। সন্ধ্যার সময় এইস্থানে আসিয়া সমুদ্রের ধারে প্রশস্ত ফুটপাথে একবার দণ্ডায়মান হইলে একদিকে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত রাগরঞ্জিত তরঙ্গায়িত নীলাম্বুবক্ষে অপূর্ব্ব সুষমা, অন্যদিকে মলবার পাহাড়ের গাত্রে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত গ্যাসালোকোজ্জ্বল সুধাধবল হর্ম্ম্যমালার মনোহারিণী শ্রী লোক-লোচনের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। সঙ্গে সঙ্গে নীলাম্বু শীকর-সিক্ত সান্ধ্যমলয়ানিল-সেবী স্বাধীনা হাস্যকৌতুকনারায়ণা পার্শী, গুজরাটী, মারহাট্টী ও ইউরোপীয় মহিলাদের বিচিত্র মনোহারিণী বেশভূষা ও তাহাদের ফুল্লকুসুমসদৃশ অপরূপ রূপমাধুরী যেন ঐ স্থানটীকে উপন্যাস-কথিত পরীধাম বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। এইরূপ রৌদ্রমধুর, শান্তোজ্জ্বল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এই মলবার হিলে পারসীকদিগের শবরক্ষার স্থান (tower of silence) অবস্থিত। এইখানে মৃত্যুর পর পারসীকদিগের শব উলঙ্গ অবস্থায় রক্ষিত হয়। শকুনি, গৃধিনীগণ আসিয়া শবদেহের মাংস ভক্ষণ করিলে হাড়গুলি একটা কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। পারসীকদিগের বিশ্বাস, শবদেহ মাটীতে পুতিয়া অথচ চিতানলে ভস্ম করিয়া বৃথা অপচয় করা অপেক্ষা বিহগকুলের ভোজ্যে পরিণত করিলে জীব জগতের অনেক উপকারে আইসে। হিন্দু শবদেহ অতি পবিত্র মনে করে। সেই পবিত্রতা রক্ষা পাবকের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না, এইজন্য হিন্দুর শব দাহ হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবেও শবদেহ দাহ করা প্রশস্ত। এইজন্য ইউরোপেও আজকাল সমদর্শী পণ্ডিতগণ অনেকে শবদাহের পক্ষপাতী হইয়াছেন। পারসীকদের এই শবরক্ষার স্থানে যাইতে হইলে পাস লইতে হয়।

ভিক্টোরিয়া পার্ক।—বোম্বাইয়ের মধ্যে একটী সুরম্য উদ্যান। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ব্যাণ্ড বাজিয়া থাকে। এই উদ্যান মধ্যে পশুশালা ও মিউজিয়ম অবস্থিত। পশুশালায় সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি নানাবিধ জীবজন্তু রক্ষিত আছে। কিন্তু এই পশুশালা আলিপুরের পশুশালার সহিত তুলনা হইতে পারে না। ইংরেজী বর্ষের প্রথম দিন বলিয়া মিউজিয়ম বন্ধ থাকায়

আমরা মিউজিয়মের ভিতর দেখিতে পারি নাই।

ভিক্টোরিয়া পার্কের নিকট সুপ্রসিদ্ধ এল্‌ফিনষ্টোন কলেজ। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ন্যায় এই কলেজের গৌরব। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজ অপেক্ষা এই কলেজবাটী দেখিতে অনেক সুন্দর।

আমরা দুইবারে তিন দিন মাত্র বোম্বাইয়ে ছিলাম। ঐ তিন দিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত ট্রামে ও গাড়ীতে ঘুরিয়াও দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সমস্ত দেখিয়া উঠিতে পারি নাই।

বোম্বাই তুলার ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। বোম্বাই বিভাগের মালব ও গুজরাট প্রদেশে প্রচুর পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হয়। সেই তুলার কতকাংশ বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল গুলিতে ব্যবহৃত হয় ও অবশিষ্ট বিলাতে রপ্তানী হয়। বোম্বাইয়ে তুলার আড়ংএর পরই সুতা ও কাপড়ের বাণিজ্য প্রধান।

এখানে কলিকাতার ন্যায় পাল্কীগাড়ীর ব্যবহার কম দেখিলাম। ভাড়াটিয়া গাড়ীর মধ্যে ভিক্টোরিয়া ও ট্যাক্সেম বেশী। উভয় গাড়ীই খোলা। পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় বয়েলের গাড়ীও পাওয়া যায়। এক প্রকার টম্‌টম দেখিলাম, তাহা ঘোড়ার পরিবর্ত্তে একটা গরুতে টানে। সে গরুগুলি দেখিতে পশ্চিম দেশীয় বয়েলের মত নয়, ঠিক বাঙ্গালা দেশের গরুর ন্যায় খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু বেশ দৌড়াইয়া চলিতে পারে। এদেশে বৃষ্টির ভাগ কম, সম্ভবতঃ এই কারণেই হউক, কিম্বা ভদ্রমহিলাগণের পর্দ্দার অন্তরালে বাস করিতে হয় না বলিয়াই হউক, পাল্কীগাড়ীর তেমন প্রচলন নাই। মুসলমান রমণীগণ প্রায় আবৃত বয়েলের গাড়ীতে যাতায়াত করে।

এখানের অধিবাসীদের মধ্যে মারহাট্টি, গুজরাটী ও পার্শীগণ প্রধান। পারশীকদের আদি বাসস্থান পারস্যদেশ। বিজয়োন্মত্ত মুসলমানগণ পারস্য জয় করিয়া অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যখন অগ্নি উপাসক পারসীকগণকে বলপূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিলেন তখন অনেকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা দেশত্যাগ শ্রেয়ঃ বিবেচনায় পারস্য হইতে আসিয়া গুজরাটে হিন্দুর নরপতিগণের আশ্রয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন,। হিন্দুজাতির একটী প্রধান গুণ যে তাহারা কোন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি পোষণ করেন না। এইজন্য পারসীকগণ হিন্দুর অধীনে নিশ্চিন্তে স্বধর্ম্ম পালন করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। ইঁহারা অত্যন্ত বাণিজ্য-নিপুণ। এই বাণিজ্য নিপুণতা তাঁহাদিগকে বিপুল বিত্ত সম্পন্ন করিয়াছে। পারসীকগণ সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য হইলেও, শিক্ষা, সভ্যতা ও অর্থের বলে ভারতের মস্তিষ্কস্বরূপ সম্মান বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। আজ তাঁহাদের অনেকের কীর্ত্তি-গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত। পারসীকেরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দোহারা ও সুন্দর। তাঁহাদের মহিলারা প্রফুল্ল কুসুমবৎ পরমা সুন্দরী। তাঁহারা ব্রহ্মরমণীর ন্যায় সাটী পরিধান করেন। তবে গাত্রে একটী লম্বা জ্যাকেট থাকে। মস্তকে অবগুণ্ঠন স্থলে একখানি সাদা রেশমী রুমাল বাঁধিয়া থাকেন। পারসীকদিগের ভাষা গুজরাটী। বহুদিন গুজরাটে বাস হেতু গুজরাটী তাঁহাদের মাতৃভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে। পারসীকগণ প্রাচীন আর্য্য অগ্নি-উপাসক। তাঁহারা উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন।

গুজরাটীরাও পারসীকদের ন্যায় বাণিজ্য-নিপুণ জাতি। বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাঁহারাও

বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন। তবে শিক্ষা বিষয়ে তাঁহারা পারসীক ভ্রাতাদের অনেক নিম্নে অবস্থিত। বোম্বাই ও আমেদাবাদের অধিকাংশ কাপড়ের কল ইঁহাদের দ্বারা পরিচালিত। গুজরাটীরা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ও নিরামিষ ভোজী। তাঁহাদের মধ্যে অনেক জৈন ধর্ম্মাবলম্বীও দেখিতে পাওয়া যায়। গুর্জ্জর রমণী গোলাপ কুসুম সদৃশ পরমরূপ-লাবণ্যবতী। তাঁহারাও বঙ্গললনার ন্যায় সাটী-পরিহিতা। বঙ্গাঙ্গনার সহিত গুর্জ্জরী-দের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীর প্রধান গুণ সরলতা, রমণীয়তা, আতিথেয়তা, ধর্ম্মপ্রবণতা, উভয়েরই সমান। পার্থক্য এই যে, একজন পর্দ্দানসীনা, অপরে স্বাধীনা, একজন অবগুণ্ঠিতা লাজ নম্র-বদনা, অপরে অনবগুণ্ঠিতা স্মেবাননা।

মারহাট্টিগণ বোম্বায়ের প্রকৃত অধিবাসী। তাঁহারা সাহসী, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে এই জাতি প্রবল পরাক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছেন। তখন তাঁহাদের প্রভাবে অন্যান্য রাজশক্তি সদা সর্ব্বদা কম্পমান থাকিত। শেষে ইংরাজের সহিত ক্রমান্বয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইয়া তাঁহারা এক্ষণে ভারতীয় অন্যান্য জাতির সমদশাপন্ন হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে তাঁহাদের জাতীয় অস্ত্র ভল্ল ও অসির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালীর ন্যায় তাঁহারাও লেখনী ও মসীর প্রভাব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাঙ্গালী চরিত্রের সহিত মারহাট্টীদের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; উভয়েই ব্যবসা বাণিজ্য অপেক্ষা চাকুরীপ্রিয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, সর্ব্ববিধ আন্দোলনে তাঁহারা পরস্পর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। মারহাট্টী মহিলাগণ কিন্তু বাঙ্গালী রমণীর ন্যায় অবগুণ্ঠিতা নহেন। তাঁহারা স্বাধীনা, নিঃসঙ্কোচে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে ও সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইতে পারেন। ইঁহারা কাছা দিয়া সাটী পরিধান করেন। প্রাচীন আর্য্য রমণীর চিত্র ইঁহাদের মধ্যেই কতকটা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুত জাতির ন্যায় ইহাদের ইতিহাসে বীর নারীর অভাব নাই। ইহাদের মুখশ্রীর কমনীয়তার মধ্যে যেমন একটু পুরুষোচিত দার্ঢ্যভাবের বিকাশ দেখিতে পাই, তেমন আর কোন জাতীয় রমণীর মুখশ্রীতে লক্ষ্য করিতে পারি নাই।

উল্লিখিত তিনজাতি ব্যতীত আরব, আবিসিনীয় প্রভৃতি অনেক দেশের লোক অতি প্রাচীন কাল হইতে বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশে বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্য বেশী নহে।

শ্রীকুঞ্জলাল সাহা।

সময়ের ফের।

গত মাসের নব্যভারতে কোন কারণ বশতঃ তাড়াতাড়ি যুগবিপ্লবের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে এখন জাতীয় জীবনে যে নৈতিক অবসাদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, তাহা মারাত্মক। এই প্রসঙ্গে দরিদ্র ফরিদপুরের কৃষি-প্রদর্শনী-মেলায় থিয়েটার প্রদর্শনের প্রতি কটাক্ষ করিতে হইয়াছিল। যুক্তি, বিচার, শুভাশুভ চিন্তা, সংযম ও নিবৃত্তি-মার্গ ত্যাগ করিয়া আমরা যে বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, দলাদলি ও

আত্মম্ভরিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছি, ইহার পরিণাম আমাদের ন্যায় দরিদ্র জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, একথাও সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা সময় ও স্থানাভাবে সংক্ষেপে যাহা ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছি, তাহাতেই অনেকের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ। এই সকল লোকের বাক্য ও আচরণ আমাদের যুক্তি ও উক্তির সমর্থন করিতেছে বলিয়া, কিছু আত্মপ্রসাদের কারণ থাকিলেও, তাহারা ব্যবহার দ্বারা আমাদের মত খণ্ডন করিলে অধিক সুখের কারণ হইত।

কেঁচো খুঁড়িতে যাইয়া কেউটে বাহির হইয়াছে। সুতরাং মূর্খস্য লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করিতে হইল। তাড়কা সংহার করিতে যাইয়া যে কীচক বধ করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। বুনো ওলের জন্য বাঘা তেঁতুল ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কাজেই কাহারও কাহারও বাল্যের শিক্ষক ও অভিভাবকগণের ত্রুটী আমাদিগকে সংশোধন করিয়া লইতে হইল। মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি না হইলে, যদুবংশ ধ্বংস হইত না। আমাদেরও ধ্বংসের পথে দুই পক্ষ দেখিতে পাইতেছি। এক দল গৌয়ারগোবিন্দ গদাধরচন্দ্র আছেন, তাঁহাদের নিকট যুক্তি নাই, মীমাংসা নাই, মনোবিজ্ঞান নাই, নীতিবিজ্ঞান নাই, বেদ নাই, পুরাণ নাই, আছে কেবল গায়ের জোর, আর গদা। ইঁহাদের আবার মার্জ্জিত সম্ভ্রমগণের জনকতক মোড়ল আছেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা নির্লজ্জের ন্যায় যত অপকার্য্যের সমর্থন করাকে অন্যায় মনে করেন না। অপর পক্ষ চীৎকার, বিদ্রূপ ও হৈ হৈ ভয়ে প্রায় নীরব। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া ভাবেন, হ'লো কি? মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, বাইনাচ, মেয়েযাত্রা, ঢপ, বারবনিতার কবি প্রভৃতি পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, কেবল খোলস বদলাইয়াছে মাত্র। জয়দেব ও ভারতচন্দ্রের ভক্তিরসের সহিত আদিরস আমাদের মেদমাংস ও অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। কিন্তু পূর্ব্বে যে কাজ লোকে গোপনে চুপে চুপে করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইত, এখন উন্নত বাবুকুল গোঁপে তা দিয়া বুক ফুলাইয়া তাহা ঢকানিনাদে জগতে প্রচার করাকে moral courage মনে করেন। ছি, ছি, মরণমুখো বাঙ্গালি! তোমাদের বালাই লইয়া মরি! কলিকাতায় এত কলসী দড়ি ও ভাগীরথীতে এত জল থাকিতে তোমাদের আর গতি হয় না কি?

সময়ের গ্রহ। পতিতা নারী ও তাহাদের সংসৃষ্ট থিয়েটারের প্রতি কটাক্ষ শুনিয়া লঙ্কার ঝাল গায়ে দিলে যেমন জ্বলুনি পুড়নি আরম্ভ হয়, কোন কোন বাপেখেদান মায়েতাড়ান ধুরন্ধর সেইরূপ মেজাজ গরম করিয়া ঠেঙ্গা লইয়া হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া স্পষ্ট কথায় গণিকারুচি জাহির করিয়াছেন। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। এরূপ নগ্নরুচি বিকারের ধৃষ্টতা ভদ্রসমাজে বোধ হয় এই প্রথম। এই সকল পাগলের গোবধে আনন্দ। তাহারা call their ancestors fools, so wiser do they grow. সাধু সাধু, বৎস ক্ষান্ত হও, তুমি বেশ্যার অঞ্চল ধরিয়া বিশ্বমঙ্গল হও, থিয়েটারে যাইয়া ভক্তিভরে লুটোপুটি খাও, তাহাতে তোমার পিতা মাতার কিছুই ক্ষোভের কারণ নাই, পিণ্ড বজায় থাকিলেই তাঁহাদের যথেষ্ট লাভ। পথও অপবিত্র করিবে, আবার চক্ষুও গরম করিয়া কাজ

কিহে বাবু? স্থানে স্থানে যেরূপ সম্পাদকীয় ধীরতা, সংযম, সুবিচার ও সুরুচি দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, এমন সময় আসিয়াছে যে, শীঘ্রই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বারনারীর বিজ্ঞাপন বাহির হইবে। বাঙ্গালা দেশে মকার সাধনের এই আরম্ভ না শেষ?

যাহাদের ব্যবসায় মাটী হয়, যাহাদের আত্মীয়স্বজনের উপর আঘাত লাগে, অথবা যাহাদের লাভের অঙ্কে হানি পৌঁছে, তাহারা বেজার হইয়া দুকথা বলিতে পারে। তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াই এসকল আলোচনা করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যাহারা আঁধারে থাকিতে ভালবাসে,তাহাদিগকে জোর করিয়া মরণের পথ হইতে জীবনের আলোর পথে আনিতে চেষ্টা করিলে তাহারাও ফণা ধরিয়া দংশন করিতে উদ্যত হয়। এ জন্য কত নীতি প্রচারক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন, কত ধর্ম্ম-প্রচারক উৎপীড়িত ও নিহত হইয়াছেন, কত সুশিক্ষক প্রহৃত হইয়াছেন, এবং কত কর্ত্তব্যপরায়ণ সম্পাদকের ভাগ্যে গঞ্জনা ও তিরস্কার পুরস্কার লাভ হইয়াছে। এত বাধা বিপদ সত্ত্বেও বিঘ্নসঙ্কুল পথে কর্ত্তব্য বোধে আমাদিগকে চলিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যে সত্য ও নীতির আদর্শ প্রচার করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, চারিদিকে বিদ্রূপ ও ভ্রূকুটিসত্ত্বেও তাহাতে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ক্ষমতাশালী লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন,—

"ব্রাহ্মসমাজ হীনবল হইলে, বিলাসের প্রশ্রয় দিলে, অর্থের আদর করিলে আমরা ব্যথা পাই। কারণ আমাদের বিশ্বাস যে, ব্রাহ্মসমাজ প্রবল ও পবিত্র থাকিলে প্রতিযোগিতায় হিসাবে হিন্দু সমাজকেও প্রবল ও অনেকটা পবিত্র থাকিতে হইবে।" ইত্যাদি।

কোন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বন্ধু সে দিন বলিতেছিলেন, জনকতক ব্রাহ্মসমাজের লোক না থাকিলে ইহারা বাঁচে।

আমি বলি, গুরু মহাশয় মরিলে কি হয়, বাবা মরিলে ত হয়! হিন্দু সমাজে এখনও কঠোর নীতির পক্ষপাতী এমন মহাশয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের পুণ্যবলে ভারতের বিশাল হিন্দুসমাজ এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে। ত্যাগ ও সংযমের দৃষ্টান্ত হিন্দু সমাজে অহরহঃ চারিদিকে যত দেখিতেছি, তাহার তুলনা বিরল। হউন না তাঁহারা মুষ্টিমেয়, মুষ্টিমেয় লোকেইত চিরকাল গড্ডলিকা-স্রোত শাসন করিয়া আসিতেছে। যাহারা স্বার্থ, লোভ, প্রবৃত্তি ও অন্ধসংস্কার দ্বারা পরিচালিত, তাহাদিগের মতের মূল্য কি? বিষস্য বিষমৌষধম্। নটকুল সম্রাট্ সেক্সপীয়র দেখাইয়াছেন, সাধুদিগের সংখ্যা অল্প হইলেও তাঁহারা জনতা-বহুল অসাধুদিগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।

Lady Macduff. Every one that does so is a traitor, and must be hanged.

Son. And must they all be hanged that swear and lie?

L. Macd. Every one.

Son. Who must hang them?

L. Macd. Why the honest men.

Son. Then the liars and swearers are fools, for there are liars and swearers enow to beat the honest men, and hang up them.

(Macbeth)

নব্য হিন্দুধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য ও নব্য

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখ-পাত্র ৺ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

"দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্র জাতি। আমাদের সুখোপভোগ চেষ্টা ভাল নয়। গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ বিজয়ী ধনশালী প্রবল প্রতাপ ইংরেজদিগের সাজে, আমাদের মধ্যে গান তামাসা নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোন মতেই শোভা পায় না। অতএব সন্তানকে বিলাসী হইতে দিতে নাই। যিনি আমাদের মধ্যে ধনবান, তাঁহারও কর্ত্তব্য ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখেন। সমাজের যে অবস্থা, তাহার অনুরূপ ব্যবহারই সমাজান্তর্গত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়া আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটী লাইকারগাস হইতে হইবে।" ইত্যাদি।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি, বঙ্গগৌরব পূজনীয় স্যর গুরুদাস জীবনে কখনও রঙ্গ দেখিতে নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করেন নাই এবং তাঁহার পুত্রদিগকেও যাইতে দেন নাই। বাজে মার্কার লোকেরা হয় ত বলিবে, ইহারা সকলেই 'ঢেঁকি।' কিন্তু আমাদের ঘরের ঢেঁকি যে সব কুমীর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার উপায় কি?

থিয়েটারের দোষগুণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের পৃথক ভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গল-কামনায় কর্ত্তব্যের অনুরোধে দুর্নীতির প্রতিবাদ করিতে যাইয়া এবং আমরা যে আপত্তিজনক নাট্যগীতাদির পক্ষপাতী নহি, তাহা স্পষ্ট কথায় বলিতে যাইয়া যদি কাহারও বিরাগভাজন হইয়া থাকি ত নিরুপায় যেহেতু সংসারে মতভেদ থাকিবেই—

কেউ নয়ন মুদে দেখে আলো, কেউ দেখে আঁধার।
কেউ বলে, ভাই, এক হাটু জল, কেউ বলে সাঁতার।

শ্রীরসিক লাল রায়।

মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন-কথা।

পল্লীগৃহ—প্রেতাবাস।

ব্লাভাস্কী পিতা ও ভগ্নীর সহিত যে পল্লীবাটীতে বাস করিতেছিলেন, উহা এবং তৎসংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র গ্রাম জেলিহোবাস্কির সম্পত্তি, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জেলিহোবাস্কির দুইটী শিশুসন্তান এবং বৈমাত্রেয় ভগ্নী লিসাও ইহাদের সঙ্গে ছিল। সম্পত্তির পূর্ব্বাধিকারীর নাম সুশেরিন। যদিও জেলিহোবাস্কি এই সম্পত্তি ক্রয় করেন, তথাপি সুশেরিনকে তিনি কখনও দেখেন নাই, এবং তৎপরিবারবর্গের কাহারও সহিত তিনি স্বয়ং পরিচিত ছিলেন না। উভয় পক্ষীয় কর্ম্মচারীগণের দ্বারাই ক্রয় বিক্রয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারী বা প্রতিবাসীদের কাহারও সহিত তাঁহার কিছুমাত্র আলাপ পরিচয় ছিল না। আর, একাদিক্রমে দশ, বর্ষকাল প্রবাসের পর স্বল্পকাল মাত্র গৃহপ্রত্যাগতা ব্লাভাস্কী যে এই স্থান ও ইহার অধিবাসী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

স্নিগ্ধ-মনোরম গ্রাম্য শোভার মধ্যে এই পল্লীবাটী অবস্থিত ছিল। মনোহর পর্ব্বত-মালা, নিবিড় দেবদারু বনবাজী, নয়নরঞ্জন সরোবর-সমূহ, এবং সুবিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যানে এই স্থানটী অলঙ্কৃত ছিল। আবাস বাটীর আকাশস্পর্শী অট্টালিকার উপর দণ্ডায়মান হইলে চতুষ্পার্শ্বস্থ ত্রিশ ক্রোশ-ব্যাপী স্থান দৃষ্টি-গোচর হইত। এই প্রকাণ্ড গৃহের উপরতলে নয় দশটী বড় বড় প্রকোষ্ঠ। ব্লাভাস্কী ও তাঁহার ভগ্নী এই খানেই থাকিতেন। নিম্ন তলে দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী কক্ষে কর্ণেল হ্যান্ থাকিতেন। বাম পার্শ্বের গৃহগুলি অতিথি-অভ্যাগতের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, কাজেই প্রায় শূন্য ও তালাবন্ধ থাকিত। এই শূন্য গৃহাংশের বাতায়ন সংস্থান বড়ই সুন্দর ছিল। অস্তাচল-গমনোন্মুখ সূর্য্যের কনকজাল বাতায়ন-শ্রেণীর উপর প্রতিবিম্বিত হইলে মনে হইত, গৃহের আদ্যন্ত অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই স্থানে আসিবার দুই তিন দিন পরে একদা অপরাহ্নে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদ্বয় উক্ত বাতায়ন পার্শ্বস্থ মনোহর পুষ্পবাটিকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। উদ্যানের প্রস্তর-বর্ত্ম দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখনই উল্লিখিত শূন্য অতিথি-শালার কোণস্থিত কক্ষটীর নিকটবর্ত্তী হইতেন, তখনই ব্লাভাস্কী কিছু অন্যমনস্ক হইয়া এক দৃষ্টে উহার গবাক্ষের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। তাঁহার মুখে ঈষৎ হাস্য অথচ একটু চিন্তার ভাব। বারম্বার এইরূপ করিতে দেখিয়া, এবং তাঁহার গুপ্ত হাস্য ও গুপ্ত দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া জেলিহোবাস্কি তাঁহাকে বিষয়টা কি, জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে উভয় ভগ্নীর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, জীবনের প্রারম্ভেই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে ব্লাভাস্কীর ধারণা কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে বলিয়া, আমরা উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

জেলি।—তুমি ও শূন্য গৃহে কি দেখিতেছ?

ব্লাভাস্কী।—যদি ভয় না পাও ত বলিতে পারি।

জেলি।—কেন ভয়ের কি আছে? আমরা সচরাচর যেমন মৃত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পাই, ইহাও সেইরূপ কিছু কি?

ব্লাভাস্কী।—সে কথা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কেন না, আমি উহাদিগকে চিনিতে পারিতেছি না। তবে আমার অনুমান সত্য হইলে, ইহারা সে লোকান্তরবাসী, এ জগৎবাসী নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা স্বয়ং লোকান্তরগত জীব হইবে, কিম্বা তাহাদের ছায়া-দেহ মাত্রও হইতে পারে। আমি কয়েকটী লক্ষণ দ্বারা এ রহস্য অবগত হইলাম।

জেলি।—(ভীত ভাবে) কি লক্ষণ? মুখ দেখিয়া কি উহাদিগকে মৃত বলিয়া বোধ হয়?

ব্লাভাস্কী।—না না। তাহা হইলে যে আমি উহাদিগকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত শবরূপেই দেখিতাম। সেরূপ দৃশ্য ত বিস্তর দেখিয়াছি। এ সেরূপ নয়। এ লোকগুলি ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া বেড়াইতেছে। যেন সম্পূর্ণ সজীব মূর্ত্তি। আর, উহাদের মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা আমাকে জানাইবার ত কোন পার্থিব হেতু দেখি না। কেন না, জীবিতাবস্থায় ইহাদিগকে কখনও দেখি নাই। কিন্তু উহাদের আকার প্রকার, বেশ ভূষা দেখিলে প্রাচীন যুগের বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীনকালের পারিবারিক চিত্রাদিতে ঐরূপ পরিচ্ছদ-প্রণালী

দেখা যায়। কেবল একটী লোকের পোষাক ভিন্ন রূপ।

জেলি —এ লোকটীর বেশ কি রূপ?

ব্লাভাস্কী।—ইহাকে একজন জর্ম্মান দেশীয় ছাত্র বা চিত্রকর বলিয়া বোধ হয়। ..... অন্যান্য লোকগুলি যেখানে রহিয়াছে, যুবক সে স্থান হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে তাকাইয়া আছে। ..দেখ দেখ! ওই লোকটী কেমন আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে, যেন আমাদিগকে দেখিয়া একটু ভীত ও চকিত হইয়াছে। আর সে ওখানে নাই, কোথায় চলিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! যেন ঐ রবিরশ্মিতে সহসা মিলাইয়া গেল।

জেলি।—আচ্ছা, আজ রাত্রিতে আমরা উহাদিগকে আহ্বান করিয়া দেখি না কেন! তখন উহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, উহারা কে?

ব্লাভাস্কী।—তাহা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? উহাদের কথায় বিশ্বাস কি? দেখ, দেখ! কি দৃশ্য! কি ভীষণ কদাকার একটা রাক্ষস! এ কে?

জেলি।—তুমি ত আমাকে কেবলই বলিতেছ, দেখ দেখ। আমার চক্ষুর সম্মুখে ত কিছুই নাই, কি দেখিব? তোমার মত দৃষ্টি-সম্পন্ন হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম। যা' হউক, ও মূর্ত্তিটা কিরূপ, একবার বল। কিন্তু যদি নিতান্ত ভয়ঙ্কর হয় ত বলিয়া কাজ নাই, আমি শুনিতে চাহি না।

ব্লাভাস্কী।—ভীত হইও না, ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। আমার প্রথমতঃ একটু ভয়ানক বলিয়া মনে হইয়াছিল মাত্র। উহারা এক্ষণ ঐ দিকে গেল, এক জনকে কিন্তু আমি তেমন ভালরূপে দেখিতে পাইতেছি না। এটী একটী স্ত্রীলোক, একবার ঐ কোণের ছায়ায় মিলাইয়া যাইতেছে, আবার পরক্ষণেই প্রকাশ পাইতেছে, অনবরত এইরূপ করিতেছে। আবার ঐ, ওখানে একটী অতি প্রাচীনা মহিলা দাঁড়াইয়া আমার দিকে তাকাইয়া আছে, যেন সম্পূর্ণ সজীব। আহা! মনে হয়, এই প্রাচীনা কি সুন্দরী কোমল-হৃদয়া রমণীই ছিল। ইহার মস্তকে ঝালর-যুক্ত টুপি, স্কন্ধের উপর শুভ্র এক খণ্ড রুমাল, পরিধানে নাতিদীর্ঘ ধবল বস্ত্র, তদুপরি রেখাঙ্কিত একখানা কাপড়।

জেলি।—তুমি যেন ফ্রেমিস দেশোচিত একটা চিত্র আপন কল্পনা হইতে অঙ্কিত করিয়া ফেলিলে! কিন্তু তোমার এই সব কথায় আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইতেছে, আমি বস্তুতঃই ভীত হইয়াছি।

ব্লাভাস্কী।—কিন্তু আমার দুঃখ হইতেছে যে, তুমি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না।

জেলি।—তা না পাই, তজ্জন্য আমি একটুও দুঃখিত নহি। প্রেতাত্মারা সুখে থাকুন। কি ভয়ঙ্কর!

ব্লাভাস্কী।—ভয়ের কারণ কিছুই নাই। উহারা সকলেই বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান। তবে ঐ বৃদ্ধ লোকটী যেন একটু অন্য রকমের।

জেলি।—এ আবার কোন্ বৃদ্ধ?

ব্লাভাস্কী।—এ বুড়ো ভারি মজার লোক। দেহ সুদীর্ঘ, জীর্ণশীর্ণ, মুখে যেন কি একটা গভীর কষ্টের ভাব অঙ্কিত। কিন্তু আমি ইহার নখ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। কি ভয়ানক, বড় বড় নখ, যেন পশুপক্ষীর নখরের ন্যায়। নখগুলি এক ইঞ্চির উপর লম্বা হইবে।

জেলিহোভাস্কি ভয়ে সহসা চীৎকার

করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি কাহার কথা বলিতেছ? নিশ্চিতই এ—।" খ্রীষ্টশাস্ত্রে সয়তানের ঐ রূপ বীভৎস নখরের কথা বর্ণিত আছে। তাই তিনি সংস্কার বশে বলিতে যাইতেছিলেন,—"এ ত সাক্ষাৎ সয়তান।" কিন্তু সয়তানের স্মরণ মাত্র তিনি ভয়ে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। তিনি বলিতেছিলেন:—"কিছুতেই মন হইতে ভয় দূর করিতে না পারিয়া আমি সেই প্রেতাধিকৃত গৃহের জানালার কাছ হইতে খানিকটা দূরে গিয়া দাঁড়াইলাম। সূর্য্য অস্তগত হইয়াছে, কিন্তু এখনও উহার সুবর্ণ আভা বিলুপ্ত হয় নাই। সেই লোহিতাভ রশ্মি-প্রভায় গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, সরোবর, সকলই স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। উদ্যানস্থ স্বভাব-মনোরম কুসুমচয় দিগন্ত-উদ্ভাসী কোমল আলোক-প্রভায় দ্বিগুণ শোভান্বিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কেবল উক্ত গৃহের সেই কোণটীই যেন এই সুন্দর সুবর্ণ-প্রভাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া এহেন দীপ্তিময় দৃশ্যোপরি একটা অন্ধকারের ছায়া পাতিত করিতেছিল। বৃদ্ধাস্থী দেবদারুর ঘনচ্ছায়াবৃত সেই আলোক-আঁধারময় কোণাস্থিকে একাকিনী দাঁড়াইয়া রহিলেন; আর আমি দূরে পুষ্পোদ্যানের নিকট আলোক-দীপ্ত সুবিস্তীর্ণ উন্মুক্ত ভূমিখণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইলাম। আমি এই স্থানে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভগ্নীকে সেই গৃহ-কোণটী পরিত্যাগ করিয়া আসিতে কত অনুনয় করিলাম। দূরে বনরাজী-বিভূষিত পর্ব্বতমালা শোভা পাইতেছে, গিরিশৃঙ্গ সমূহ সায়ং কালীন সৌরকরমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, প্রশান্ত নির্ম্মল সরসী গুলির স্ফটিক-স্বচ্ছ সলিলরাশি তীরস্থ বনের শ্যামল শোভা প্রতিবিম্ব রূপে বক্ষে ধারণ করিয়া নয়ন মন হরণ করিতেছে, প্রাচীন দেবালয়ানী ঘন-সন্নিবিষ্ট ভূর্জ্জবৃক্ষ সমূহের মধ্যে দেহ লুক্কায়িত করিয়া যেন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন রহিয়াছে, এবং দিঙ্‌মণ্ডল সুবর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া যেন সহর্ষে হাস্য করিতেছে। আমি ভগ্নীকে সেই অন্ধকারময় গৃহকোণটী পরিত্যাগ করিয়া এই মনোহর বৈকালিক দৃশ্য দেখিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলাম। অনেক বলিতে বলিতে তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং চিন্তিত ভাবে বলিলেন যে যাহাকে তিনি দেখিতেছিলেন, সে লোকটা কে, ইহা যেরূপেই হউক, জানিতে হইবে। মূর্ত্তিগুলি যে ঐ শূন্য প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বাধিবাসী কোন কোন লোকের সূক্ষ্ম ভৌতিক ছায়া, এ বিষয়ে তাঁহার আর কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন—'এ বৃদ্ধ লোকটীকে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। কেন এ ব্যক্তি ভয়ঙ্কর লম্বা লম্বা নখ রাখিয়াছে! আরপর আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহার মস্তকে যে কালো টুপিটা রহিয়াছে, তেমন উচ্চ টুপি ত কখনও দেখি নাই,—কতকটা যেন আমাদের খ্রীষ্ট ভিক্ষুদের ন্যায়।"

জেলিহোভাস্কি এই সকল কথা শুনিয়া এত ভীত হইয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে আর আলোচনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলিলেন,—'উহারা যে হয় হউক। আমাদের ও সব ভয়ঙ্কর শ্রেণীর অনুসন্ধানে কাজ কি? তুমি আর এ সম্বন্ধে চিন্তা করিও না।'

বৃদ্ধাস্থী।—কেন? আমি ত ইহাতে বড়ই আমোদ পাইতেছি। কারণ আমি পর্ব্বের ন্যায় এক্ষণ আর বড় একটা এই সব

দৃশ্য দেখিতে পাই না। মিডিয়মেরা নাকি সর্ব্বদাই ভূত প্রেতে বেষ্টিত থাকে। আমার ইচ্ছা হয়, আমিও একজন মিডিয়ম হই! তাহা হইলে বাল্যের ন্যায় এখনও আমি এই সকল প্রেত-দেহ প্রায়শঃ দেখিতে পাইব।...গত-রাত্রে আমি লিসাব (ব্লাভাস্কীর সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগ্নী) ঘরে বিলম্বিত-শ্মশ্রু, সুদীর্ঘকায় একজন ভদ্রলোককে দেখিয়াছিলাম।

জেলি।—কি? শিশুদের শুইবার ঘরে আমি তোমাকে করযোড়ে সানুনয়ে বলিতেছি, অন্ততঃ শিশুদের গৃহ হইতে লোকটাকে তাড়াইয়া দাও। আমি ইহা শুনিয়াই একে-বারে হতবুদ্ধি হইয়াছি, আর তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াও বেশ নিশ্চিন্ত আছ?

ব্লাভাস্কী।—ভয় কি? নিতান্ত উত্যক্ত বা উত্তেজিত না হইলে ইহারা প্রায়ই কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। ভয় দূরে থাকুক, আমার মনে এই সকল হতভাগ্য প্রেত-দিগের প্রতি স্বতঃই একটা ঘৃণা অথচ করুণার ভাব জাগিয়া উঠে। বস্তুতঃ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনুষ্য মাত্রেই কোটী কোটী প্রেত-দেহে সদা বেষ্টিত রহিয়াছে। এ জাতীয় প্রেতদেহ আর কিছুই নহে,—পরলোকগত জীবের পরিত্যক্ত ছায়াতুল্য এক প্রকার সূক্ষ্ম কোষ মাত্র।

জেলি।—তাহা হইলে, তোমার মতে উক্ত ভূতগুলি মৃতদের এক প্রকার সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে?

ব্লাভাস্কী।—সে বিষয়ে আমার কিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ফলতঃ, ইহা আমার 'জানা' ও 'দেখা' কথা।

জেলি।—আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবাদি প্রিয়-বর্গেই কেন না আমরা সদা বেষ্টিত থাকি? শুধু কতকগুলি সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিই কেন আসিয়া আমাদিগকে বিরক্ত করে? যাহাদের জন্য আমরা একটুও ভাবি না, যাহাদিগকে কখনও জানি না, কখনও ডাকি না,—এমন সকল অনাহূত অজ্ঞাত কুলশীলের দল আসিয়া কেন আমাদিগকে জ্বালাতন করে?

ব্লাভাস্কী।—বড় কঠিন প্রশ্ন! হায়! কতবার ব্যগ্র হৃদয়ে খুঁজিয়া দেখিয়াছি, যদি এই প্রেত ছায়া-গুলির ভিতরে একটী প্রিয় বন্ধুকে, একটী আত্মীয়কেও দেখিতে বা চিনিতে পাই। দুই এক দিনের পরিচিত বা বহুদূর সম্পর্কীয় দুই এক জনকে কখন কখন দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহারা যেন আমাকে দেখিয়াও দেখিল না। আর যখন উহাদিগকে দেখিবার জন্য কোন আশা করি নাই, ইচ্ছাও হয় নাই, তখনই কিন্তু উহাদের দেখা পাইয়াছি! হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কত কামনা, কত চেষ্টা করিয়াছি, যদি একটী বারও কোন প্রিয়তম বান্ধবের মুখ দেখিতে পাই। কিন্তু সকলই বৃথা। আমি এ বিষয়ে যতদূর বুঝি, তাহা এই। জীবিত ব্যক্তি যারা আকৃত বা আকৃষ্ট হইয়াই যে মৃতগণ আইসে, তাহা নহে, কিন্তু যে যে স্থানে উহারা সর্ব্বদা বাস করিত, যে স্থানের আকাশে উহাদের ব্যক্তিগত ভাব ও আকার সূক্ষ্মরূপে চিত্রিত ও সংলগ্ন হইয়া আছে,—সেই সেই স্থানের গুণেও উহারা আকৃষ্ট হয়। তোমার যে সকল পুরাতন ভৃত্য এই স্থানে জন্মিয়াছে ও আজন্ম বাস করিতেছে, বলত, তাহাদের দুই এক জনকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মাত্র যে সকল মূর্ত্তি দেখিলাম, নিশ্চয়ই পুরাতন ভৃত্যদের নিকট উহাদের কাহারও কাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এই পরামর্শ উত্তম, স্থির করিয়া, তৎক্ষণাৎ দুই ভগ্নী পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুইজন অতিবৃদ্ধ ভৃত্যকে ইহাঁদের নিকট উপস্থিত করা হইল। ইহাদের সহিত এই বাটী সম্বন্ধে অন্যান্য নানা কথোপকথনের পর গৃহস্বামিনী জেলিহোবাস্কি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা জান, এই বাড়ীতে এমন কোন বৃদ্ধ লোক বাস করিত, যে মাথায় খুব লম্বা কালো রংয়ের একটা টুপি পরিত, ভয়ানক লম্বা লম্বা নখ রাখিত, আর ধূসর বর্ণের একটা কোট গায়ে দিত।"

এই কথা শুনিবা মাত্র বৃদ্ধদ্বয় এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া এত কথা বলিতে লাগিল যে, তখন তাহাদিগকে থামান দায় হইয়া উঠিল। তাহাদের কথার মর্ম্ম এই,—'তাঁহাকে আমরা জানি না? ভালরূপ জানি। তিনি আর কে? তিনি ত আমাদের আগেকার কর্ত্তা। তিনি ঐরূপ বেশে থাকিতেন।' ঈদৃশ বেশ ধারণের কারণ সম্বন্ধে জেলিহোবাস্কির প্রশ্নের উত্তরে ভৃত্য বলিল,—'তাঁহার একটা ব্যারাম ছিল, উহা কিছুতেই সারিল না। লিথুনিয়া দেশে তিনি কয়েক বৎসর থাকেন, শুনিয়াছি, সেই স্থানেই তাঁহার এই পীড়ার উৎপত্তি। এই পীড়ার * দরুণ তিনি কখনও কেশ নখাদি কাটিতে পারিতেন না, আর সদাই তাঁহাকে পুরোহিতের টুপির ন্যায় একটা লম্বা মখ্‌মলের টুপিতে মাথা ঢাকিয়া রখিতে হইত।'

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে আরও জানা গেল যে, পূর্ব্বোক্ত সেই 'অর্দ্ধফ্লেমিশোচিত' বেশযুক্তা রমণী এই বাটীতে বিশ বৎসর কাল গৃহ-রক্ষিকার কার্য্য করিয়া ঐখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং জর্ম্মণ ছাত্রের ন্যায় প্রতীয়মান যুবকটী প্রকৃত পক্ষেই ঐ দেশাগত একটী ছাত্র ছিল, তিন বৎসর হইল যক্ষ্মা রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহাও জানা গেল, মৃত্যুর পর উহাদের শবদেহ তিন, চার কিম্বা পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ঐ গৃহে রক্ষিত ছিল; তৎপর পারিবারিক দেবালয়ের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাধি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

জেলিহোবাস্কি বলিতেছেন,—"সেই দিন হইতে শুধু ব্লাভাস্কী নয়, কিন্তু আমার ছোট ভগ্নী নবম বর্ষীয়া লিসা পর্য্যন্ত গৃহমধ্যে নানা অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তির দর্শন পাইতে লাগিল। গৃহটী যেন মৃত ব্যক্তিদের প্রেতচ্ছায়ায় এবং ভূতকালীন ঘটনাবলীর চিত্রে পরিপূর্ণ। আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্লাভাস্কীর ন্যায় সেই ক্ষুদ্র বালিকাও ঐ সকল প্রেত-দেহ দেখিয়া কিছু মাত্র ভীত হইত না। তাহার বিশ্বাস, উহারাও তাহার ন্যায় জীবন্ত, মানুষ, কিন্তু চিনিতে না না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিত—ইহারা কে, কোথা হইতে আসিল, ইত্যাদি। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্লাভাস্কীর চেষ্টায় বালিকার এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি শীঘ্রই অপসারিত হইল, এবং পরে আর কখনও উহার উক্ত ক্ষমতা দেখা যায় নাই। কিন্তু ব্লাভাস্কীর স্বাভাবিক সূক্ষ্মদৃষ্টি শক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। উহা তাঁহার এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, কোন দূরবাসী আত্মীয় স্বজন বা ভৃত্যাদির মৃত্যু সংবাদ আর তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানাইতে হইত না। আমরাও তাঁহাকে এরূপ লিখিয়া জানাইবার কোনও আবশ্যকতা দেখিতাম না। কেননা, সংবাদ পহুঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত ব্যক্তি যেন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া

* ডাক্তারি ভাষায় এই পীড়ার নাম প্লাইকা পেক্লোনিকা (Plica-paclonica)। ইহা এক প্রকার চর্ম্মরোগ বিশেষ। ইহাতে নখাদি কাটিলে রক্তস্রাব হইয়া রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

স্বীয় মৃত্যু সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিত। আমাদের প্রেরিত সংবাদ তাঁহার নিকট পহুঁছিবার পূর্ব্বেই, অথবা ঠিক মৃত্যু সময়েই হয়ত তাঁহার লিখিত পত্র পাইতাম। পত্রে মৃত ব্যক্তির সহিত তাঁহার কি প্রকারে, কি অবস্থায় দেখাশুনা হইয়াছে, তাহা আমূল বর্ণিত থাকিত। * * * গৃহবাসী কি ভদ্র, কি ইতর, সকলেই সর্ব্বদা, এমন কি, দিবা দ্বিপ্রহরের দেদীপ্যমান আলোকেও দেখিতে পাইত যে, গৃহের আসে পাশে, উপবনে, পুষ্পবাটিকায়, কিম্বা প্রাচীন দেবালয়ের সন্নিকটে অস্পষ্ট মানবছায়া-সমূহ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। পিতা মহাশয়—যিনি এক সময়ে ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন—স্বয়ং এবং লিসার শিক্ষয়িত্রী আমাকে কতবার বলিয়াছেন যে, এই মাত্র তাঁহারা ঐ রূপ কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিয়া আসিলেন। ইত্যাদি।"

প্রেতাহ্বান-চক্রে সচরাচর দৃষ্ট প্রেতদৃশ্য সম্বন্ধে গোড়া হইতেই ব্লাভাস্কী কিরূপ মত পোষণ করিতেন, ইহা আমাদের জানিয়া রাখা উচিত। কেবল উচিত নহে, সত্য নির্ণয়ার্থ ইহা একান্ত আবশ্যক। কেননা, কয়েক বৎসর পরে আমেরিকায় প্রেততত্ত্ব লইয়া তথাকার প্রেততাত্ত্বিকগণের সহিত মাদাম ব্লাভাস্কীর যে বাদানুবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে কোন্ পক্ষ কতদূর ন্যায় ও সত্য দ্বারা চালিত হইয়াছিল, পূর্ব্বাপর তাঁহার মত জানা থাকিলে তাহা বুঝা যাইবে। এই উদ্দেশ্যেই আমরা উপরোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সিনেট মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও ব্লাভাস্কীর মত সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি নিজ গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ণিত প্রেত-কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন :—

"উপরোক্ত বিবরণের কোন কোন অংশ সম্বন্ধে ব্লাভাস্কী স্বয়ং যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত হইবেন, সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, যাহাদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন; এবং যাহাদের মৃত্যুতে তিনি নিতান্ত ব্যথিত, সেই সব প্রিয়তম ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করিবার জন্য স্বয়ং এবং বিখ্যাত মিডিয়মের সাহায্যে অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কখনও কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তাহাদের সম্পর্কে অনেক সংবাদ ও তথ্য লাভ করিতেন বটে, তাহাদের স্বাক্ষরও প্রাপ্ত হইতেন বটে, এমন কি, দুইবার তাহাদের স্থূল মূর্ত্তিও দেখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুই স্থির রূপে প্রতিপন্ন হয় নাই; কেন না, তাহাদের নাম করিয়া যাহা লিখিত বা ব্যক্ত হইত, উহার ভাষা এরূপ অস্পষ্ট ও অসবল যে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সুপরিচিত লেখার সহিত, এ লিখন ভঙ্গির কিছু মাত্র সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইত না।* তিনি বিচার পূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া-

* এ সম্বন্ধে জেলিহোবাস্কি অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"ভৌতিক যন্ত্র সাহায্যে প্রকাশিত বিষয়ে আমরা নানারূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতাম, কেন না, সকলেই জানেন যে, ক্রিয়া-গৃহে অনেক সময় দুরাত্মা দুষ্টাভিলাষী ভূত প্রেতগণ আসিয়া কোন বিখ্যাত মহাবশা ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে; কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই তাহাদের কথায় ও ব্যবহারেই তাহারা ধরা পড়ে, তখন তাহাদের প্রকৃত পরিচয় পাইতে আর কাহারও বাকী থাকে না। কেহ হয় ত আসিয়া আপনাকে মহা জ্ঞানী সক্রেতিস বা ইতিহাসখ্যাত সিসারো, বা ধর্ম্মবীর মার্টিন লুথার বলিয়া প্রকাশ করিল। আর যখন কথা বলিতে আরম্ভ করিল, তখন ঠিক যেন একটী সার্কাসের সং। ইহাতে তাহাদের মিথ্যা পরিচয় কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে?"

ছেন যে, স্বাক্ষরগুলি মৌলিক নহে, কিন্তু তাঁহারা নিজ মস্তকস্থিত চিত্রের প্রতিলিপি মাত্র। যে স্থানে মিডিয়ম খাঁটি, অকৃত্রিম হইত, সে স্থানে রাশি রাশি ভূত ও অপদেবতা সমবেত হইত, সন্দেহ নাই। মিডিয়ম তখন উহা দেখিয়া উদ্দিষ্ট আত্মার আগমন ঘোষণা করিত। মিডিয়ম জানিত না যে, তাহার ন্যায় ব্লাভাস্কীও সহজে সকল সূক্ষ্ম দৃশ্যই স্বচক্ষে দেখিয়া লইতে পারেন। তিনি বলেন যে, মিডিয়মের ঘোষণা সত্ত্বেও সেই সকল ভূত ও অপদেবতা সমূহের মধ্যে তাঁহার উদ্দিষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত আত্মার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেন না, উহার অস্তিত্বের কোনই নিদর্শন পাইতেন না। যবং তদ্বিপরীত লক্ষিত হইত। কারণ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন যে, উদ্দিষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু সম্বন্ধে তাঁহার স্বীয় অন্তঃকরণে যে স্মৃতি সংস্কার সংলগ্ন হইয়া আছে, সেই স্মৃতি ও সংস্কারবাশিই মিডিয়মের মস্তিষ্কক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় তদোচিত ভাবে কতকটা অনুরঞ্জিত ও বিমিশ্রিত হইয়া যাইত, তৎপরে 'স্পঞ্জে' যে রূপে জল শোষণ করে, সমাগত প্রেতদেহগুলিও সেইরূপে ঐ রূপান্তরিত ও বিকলিত সংস্কারগুলিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্মৃতিবাহী সেই সূক্ষ্ম বন্ধুমূর্ত্তিকে স্থূলরূপে প্রকটিত করিয়া দিত। ব্লাভাস্কী বলেন, 'আমার চক্ষে এগুলি মুখস-পরা বিকট রূপেই প্রতীয়মান।' ইহা দেখিয়া প্রকৃত বন্ধু-সমাগমের আনন্দের পরিবর্ত্তে তাঁহার অতীব ঘৃণার উদ্রেক হইত। তিনি বলেন,—আমেরিকায় এদির গৃহে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপের মধ্যে আমার পিতৃব্যের যে স্থূল মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহাও ঐরূপ মদীয় চিত্ত প্রতিচ্ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি তখন কতকগুলি ক্রিয়া পরীক্ষা উদ্দেশ্যেই এদির গৃহে গিয়াছিলাম, সুতরাং সকল কথা তখন কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, কিন্তু পিতৃব্যের ঐ স্থূল মূর্ত্তি আমিই আমার চিত্তগত সূক্ষ্ম পিতৃব্য মূর্ত্তির অনুরূপে বাহ্যে প্রকটিত করি। মিডিয়মের স্থূল শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম পরমাণু বা তন্মাত্রা দ্বারা গঠিত দেহকে আমি যেন আমার চিত্তগত পিতৃব্যমূর্ত্তির আবরণে আবরিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত করিলাম। আমি জানিতাম, উইলিয়ম এদি একজন অকৃত্রিম মিডিয়ম, এবং এ ক্রিয়াটীও যতদূর অকৃত্রিম হইতে হয়, তাহা হইয়াছিল। আমি ইহার অনুষ্ঠান-প্রণালী স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। এই জন্যই যখন এই বিষয় লইয়া নানা বাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হইল, তখন আমি প্রকাশ্য সংবাদপত্রে অকৃত্রিম-চিত্ত এদির পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহার উপর আরোপিত দোষের নিরাকরণ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। সে যাহা হউক,

যে ভাল অভিনেতা, সে অবশ্যই একেবারে সার্কাসের সং বলিয়া পরিগণিত না হইতে পারে। তাহার প্রতারণা ধরা কেবল তীক্ষ্ণদর্শীগণেরই সাধ্য। সাধারণ দর্শক বা শ্রোতার প্রতারিত হইবার বেশ সম্ভাবনা। যাহাই হউক, আমাদের দেশেও যাঁহারা প্রেততত্ত্বের অনুশীলন করেন, এই কথাগুলি তাঁহাদের বিবেচ্য। কারণ আমরা তাঁহাদের মুখে সচরাচর শুনিতে পাই যে, কখনও বঙ্কিমচন্দ্র, কখনও কেশবচন্দ্র, কখনও বা ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি মহাত্মাগণের আত্মা আসিয়া তাহাদিগকে নানা কথা বলিয়া বা লিখিয়া জানাইয়া গেলেন। একটী বিষয় বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পরলোকগত প্রথিত-যশা পুরুষগণের উক্তি বা রচনা বলিয়া যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, গভীর তত্ত্বদর্শিতা এবং সুপরিচিত রসজ্ঞতার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? সমাজের কল্যাণার্থ আমাদের দেশের সত্যার্থী প্রেতবাদীগণের এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

আমি এতদিন আমেরিকার প্রেততত্ত্বে নানা জ্ঞান লাভ করিলাম, কিন্তু একটী দিনের তরেও যাহাদিগকে দেখিতে প্রাণ চায়, তাহাদের দেখা পাইলাম না। তবে যে সকল বান্ধবের সহিত আমি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, আত্মিক স্নেহসূত্রে আবদ্ধ, স্বপ্নযোগে অথবা নিজলব্ধ অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি সাহায্যে তাঁহাদের দর্শন লাভ করিয়াছি বটে।' ব্লাভাস্কী নিজ অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অভিমতও তদনুরূপ। তাহা এই। "যাহারা আমাদের একান্ত প্রিয়, তাহাদের প্রেতমূর্ত্তি কখনও আমাদের সমক্ষে আসিবে না। কোন কোন স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেও, সাধারণতঃ উহা সত্য। ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আধ্যাত্মিক চৌম্বকার্ষণ ঘটিত কতকগুলি ব্যাপারই ইহার কারণ, এস্থলে সে সুদীর্ঘ জটীলতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার আমাদের অবসর নাই। পরলোকবাসী প্রিয়তমগণের অস্মৎ সকাশে আগমনের কোন আবশ্যকতা নাই। কেন না, নিতান্ত দুষ্টাত্মা না হইলে, তাঁহারা নিশ্চিতই দেবস্থান নামক পরম আনন্দময় অবস্থায় গমন করিয়া প্রিয়বর্গের দর্শনসুখ লাভ করিয়া থাকে। এই দেবস্থানেই পুরুষ নিজ পবিত্র ভালবাসার বস্তু, স্বীয় চিত্তানুরূপ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা-সম্ভূত সমস্ত সুখকর বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে। মৃত্যুর কিছু কাল পরে জীবের উচ্চবৃত্তি, অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান-পুণ্য প্রভৃতি আত্মমুখী বৃত্তি দ্বারা গঠিত উচ্চ তাত্ত্বিক দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে তাহার প্রেতদেহ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এবং একবার বিচ্ছিন্ন হইলে এই উচ্চ তাত্ত্বিক দেহের সঙ্গে আর ঐ নীচ প্রেতদেহের কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই পরিত্যক্ত, নীচ কামনার ক্রীড়াস্থল স্বরূপ প্রেতদেহ উহার আত্মীয় পরিজনের নিকট কখনও যাইবে না, কিন্তু সংসারে যাহাদের সহিত উহার অপবিত্র প্রণয়, বা ঐন্দ্রিয়িক সুখলালসা-সম্ভূত সম্বন্ধ বা ভালবাসা রহিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির নিকটই আকৃষ্ট হইবে। ইত্যাদি।"

সিনেটের এই কথাগুলি ব্লাভাস্কী-প্রদত্ত শিক্ষার সম্পূর্ণ সম্মত। কিন্তু ইহার আরও একটু বিবৃতি আবশ্যক। ব্লাভাস্কী সাধারণের হিতার্থ নিজ মতানুসারে প্রেতবাদীগণের অপসিদ্ধান্ত গুলির অযথার্থতা যখন প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহারা বড়ই অসন্তুষ্ট ও নানা কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলাফল আমরা পরে জানিতে পারিব। এবং তৎ প্রসঙ্গে অধ্যাত্ম শাস্ত্রের এই অংশ, অর্থাৎ পারলৌকিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মত আমরা আরও একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীদুর্গনাথ ঘোষ।

প্রকৃত ভজনতত্ত্ব।

যে শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা অসীম ও অনন্ত। সকলই শক্তির ক্রিয়া। শক্তি ভিন্ন যে কিছু আছে, এমন বোধ হয় না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পাঁচ লইয়া বহির্জগৎ। বহির্জগতে যে আর কিছু আছে, এমন দেখিতে পাই না। কিন্তু মনে হয় যে, ঐ যে পাঁচটী বিষয়, উহাও শক্তির ক্রিয়া। আদি, মধ্য, অন্ত, সকলই শক্তি। শক্তি ভিন্ন কিছু নাই।

কিন্তু শক্তি বলিলেই শক্তিমান বুঝায়।

সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক শক্তিমানের প্রকাশ। এ কথা বলিলে লোকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া নিন্দা করিবে। কিন্তু কি করিব? যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেছি, তাহাই বুঝিতে হইবে, তাহাই বলিতে হইবে। এক ব্রহ্মশক্তি সকল ব্রহ্মাণ্ডে ক্রিয়া করিতেছে। জগতের যাহা কিছু, সকলই সেই ব্রহ্মশক্তির রূপ। ব্রহ্মশক্তি বিভিন্ন আকারে বিশ্বরূপে প্রকাশ হইতেছে। সেই জন্য গীতাকার তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলিয়াছেন।

এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই প্রকাশ। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, তাঁহার শক্তি সকলই বিশ্বরূপে প্রকাশ হইতেছে। যাহা দেখি, তাহাই তিনি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সকলই তাঁহারই প্রকাশ। সুতরাং বলা হইল যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধারণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের ঋষিগণ ইহা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন।

এক দিকে যেমন ইহা সত্য, সেইরূপ, আবার ইহাও সত্য যে, এ সকলের কিছুই তিনি নহেন। এ সকল পরিমিত, তিনি অনন্ত, এ সকল ক্ষণস্থায়ী, তিনি চিরস্থায়ী, এ সকল তাঁহার অধীন, তিনি স্বতন্ত্র। তিনি নিত্য, সত্য, সনাতন; এ সকল অনিত্য, অসত্য, অচিরস্থায়ী। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ যেমন এক দিকে এক হইল, সেইরূপ আবার অন্য দিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সকলের কিছুই তিনি নহেন।

এই তত্ত্বকে অদ্বৈতবাদ বলা যায় না। ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলিলেই ভাল হয়। তিনি এই জগৎরূপে প্রকাশ হইতেছেন, ইহা সত্য, আবার এ সকলের তিনি কিছুই নহেন, তাহাও সত্য। এই দুই বিপরীত কথা সত্য।

ধর্ম্মরাজ্যে এরূপ আরও আছে। পরস্পর বিপরীত কথা, উভয়কেই সত্য বলিয়া মানিতে হয়। যেমন, অনন্ত ও পরিমিত। যাহা অনন্ত, তাহাই পরিমিত রূপে প্রকাশ পাইতেছে। অনন্ত কি? না, যাহা পরিমিত নহে। পরিমিত কি? না, যাহা অনন্ত নহে। তাহা হইলে, এ দুইয়ে সম্বন্ধ দেখা গেল। অনন্তকে বুঝিতে হইলে, পরিমিতকে বুঝিতে হয়। আবার, পরিমিতকে বুঝিতে হইলে অনন্তকে বুঝা যায়। এই দুই একই জ্ঞানের দুই দিক্।

তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, মানুষের অনন্তের জ্ঞান আছে। অনন্তের জ্ঞান না থাকিলে, পরিমিতের জ্ঞানও থাকে না। এই দুই আপেক্ষিক। অনন্ত ও পরিমিত, পরস্পর সাপেক্ষ। মানুষের মধ্যে অনন্ত না থাকিলে, মানুষ কেমন করিয়া অনন্তকে জানিবে? অনন্তই অনন্তকে জানিতে পারেন। পরিমিত কেমন করিয়া অনন্তকে জানিবে? কূপ-মণ্ডূক কেমন করিয়া পৃথিবীকে জানিবে? যাহাতে যাহা নাই, সে তাহা কখনই বুঝিতে পারে না। অন্ধ কখন বর্ণজ্ঞান পাইতে পারে না। বধিরের পক্ষে সঙ্গীতের জ্ঞান অসম্ভব। সেইরূপ, যে বাস্তবিক পরিমিত, সে কখন অনন্তকে জানিতে পারে না।

তবেই বুঝা গেল যে, মানুষে অনন্ত আছেন। অথবা এমনও বলা যায় যে, মানুষ নিজেই অনন্ত। অনন্ত না হইলে, কেমন করিয়া অনন্তকে বুঝিবে? "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে" তবেই প্রতিপন্ন হইল যে, এক ভাবে, মানুষই অনন্ত। একভাবে, মানুষ, সেই অনন্তের পরিমিত প্রকাশ। আবার, আর এক ভাবে, মানুষ নিজেই অনন্ত। নতুবা কেমন করিয়া অনন্তকে

বুঝিবে? সেই জন্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ উড়াইয়া দিবার কথা নয়। যিনি অনন্ত, তিনিই মানুষ হইয়াছেন। ইহা অযুক্ত কথা নয়। ইহার মধ্যে অমূল্য সত্য আছে।

এখন আর একটী অতি প্রয়োজনীয় কথা বলি। সে কথা এই যে, এক দিকে যেমন মানুষ অনন্ত, সেইরূপ, আর এক দিকে মানুষ, ক্ষুদ্র, পরিমিত। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, ধর্ম্মরাজ্যে পরস্পর-বিপরীত কথা সত্য। মানুষ, অনন্ত, আবার মানুষ ক্ষুদ্র কীট। দুই-ই সত্য। আপাততঃ মনে হয়, ইহা অসম্ভব। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, ইহার মত সত্য আর কিছুই নাই।

এই সত্যটী না বুঝিলে, ভগবানের প্রকৃত ভজন সম্ভব হয় না। এক ভাবে দেখিলে, তিনি আপনার ভজন আপনি করিতেছেন। আর এক ভাবে দেখিলে, জীব তাঁহাকে ভজিতেছে। এ দুই সত্য। কে কাহার ভজনা করে? ভজন-তত্ত্ব বড় সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই জীবের চক্ষু খুলিয়া যায়। যত দিন না বুঝে, ততদিন অন্ধ থাকে। তিনিই চক্ষু খুলিয়া দেন।

ভজন তত্ত্ব অতি চমৎকার তত্ত্ব। ইহার এক দিকে মানুষ, আর এক দিকে ব্রহ্ম। কিন্তু সেই ব্রহ্মই আবার মানুষ হইয়াছেন। সুতরাং কেন বলিব না যে, তিনি আপনি আপনার ভজন করিতেছেন। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, এ দুই এক হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা যায়।

কেবল অদ্বৈতবাদ কিছু নহে। আবার কেবল দ্বৈতবাদ কিছু নহে। এই দুইয়ের সামঞ্জস্যই প্রকৃত তত্ত্ব। জ্ঞানী ভক্ত এই তত্ত্বে উপনীত হন। এখানে না আসিলে, চক্ষু খুলে না। মানুষ অন্ধ থাকে। প্রথম অবস্থায় থাকে, তুমি আমার, আমি তোমার। তার পর কিছু অগ্রসর হইলে "তুমি আমি, আমি তুমি" হইয়া যায়। একথা সকলে বুঝিবেনা। কিন্তু যে বুঝিয়াছে, সে-ই মজিয়াছে! ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন এ অবস্থা হয় না।

যাঁহারা মনে করেন, কেবল নিজের সাধন ভজনে সব হয়, তাঁহারা কিছুই বুঝেন না। তাঁহারা অন্ধ। নিজের সাধন ভজনে এই পর্য্যন্ত হয় যে, বুঝা যায় নিজের শক্তিতে কিছু হয় না। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন কিছু হইবার নহে। 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং' এই মহা বাক্যের অর্থ তখন বুঝা যায়।

ধর্ম্মের যে সকল সাধারণ কথা, যাহা সকলেই বলে, তাহারও অর্থ বুঝিতে অনেক সাধন ভজন প্রয়োজন। ধর্ম্মজীবনের ক হইতে খ পর্য্যন্ত সকলই ব্রহ্মকৃপা। কেহ কেহ বলেন, আত্মপ্রসাদাৎ দেবপ্রসাদাৎ। নিজের চেষ্টা ও পরমেশ্বরের কৃপা। আমি বলি, নিজের চেষ্টা কোথায়? সকলই ব্রহ্মকৃপা। যাহা নিজের চেষ্টা, তাহাও তো ব্রহ্মকৃপা। ব্রহ্মকৃপা, নিজের চেষ্টার রূপ ধারণ করে। দেবপ্রসাদ, আত্ম-প্রভাবের আকার ধারণ করে।

হে প্রভো! তোমার ভজন-তত্ত্ব আমি কি বুঝি? তুমি যে আপনার ভজন আপনি কর, একথা কে বুঝে? তুমি বুঝাইয়া দিয়াছ, তাই বুঝিয়াছি। নিজের বুদ্ধি বলে, সাধন বলে কে বুঝিতে পারে? তুমি না বুঝাইলে, কাহার সাধ্য যে, এই গূঢ়-তত্ত্ব বুঝিতে পারে। আমাকে বুঝাইয়াছ, তাই বুঝিয়াছি। আরও কত বুঝাইবে। অনন্ত পথে যত চলিব, ততই কত নূতন তত্ত্ব শিখিব। তুমি আমার চির

দিনের গুরু। অন্ত গুরু জানি না। মানুষ যদি কিছু শিখাইয়া থাকেন, তাহাও তুমি তাঁহার মধ্য দিয়া শিখাইয়াছ। সেইজন্ত বলি, তুমিই অখিল-গুরু। তুমি মাতা ও পিতা। তথাচ যেমন মানুষ মা ও মানুষ পিতাকে ভক্তি করি, সেইরূপ তুমি গুরু হইলেও মানুষ গুরুকেও মানি। তাঁহার মধ্য দিয়া তুমিই শিখাইয়াছ। তুমিই আমার গুরু। হে গুরুদেব! অনন্ত কালে কত শিখাইবে। আমি তোমার শিষ্য বা ছাত্র হইয়া, চিরদিনই শিখিব। কাহার মধ্য দিয়া শিখাইবে, তাহা জানি না। কিন্তু এই জানি যে, তুমিই শিখাইবে।

পরলোকবাসী আত্মা শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার,
মিডিয়ম শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আহিতাগ্নি আর্ট। (১)

কলাধর্ম্ম আকাশ হইতে উড়িয়া আসা বিপজ্জনক। যেখানে তাহা এইরূপে জনতার চিত্তকে দখল করিতে চাহে, সেখানকার চেষ্টা পরম্পরার মাঝে হেঁয়ালী কতটুকু আছে, কতটুকু সত্য পদার্থ আছে, ঠিক করা কঠিন হইয়া পড়ে। ছদ্মবেশের পারিপাট্য, আড়ম্বরের ঐশ্বর্য্য চোখে ম্যাজিকের ধূলি নিক্ষেপ করিতে চাহে।

বিশেষতঃ যেখানে ঐতিহাসিক অনুবর্ত্তনের দাবী আছে, পৌর্ব্বাপর্য্যরক্ষার যে সমস্ত বহিরুপকরণ আছে, তাহা যেখানে অর্থ ও বুদ্ধিবলে পুঞ্জীভূত, সেখানে ধাঁধা হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন, সন্দেহ নাই।

ললিত চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, রস্কিনের ভাষায় বলিতে হয়, শিল্পীর প্রধান অস্ত্র তাহার কর-যুগল, ইহাদেরই পেশী ও স্নায়ুর নিবিড় নিয়ন্ত্রিত হিল্লোলে তুলিকা কম্পিত হইয়া অসংখ্য রেখা-ভঙ্গীর দ্বারা সুন্দরকে বুনিয়া তোলে। হস্তযুগলকে হঠাৎ একদিন ফরমায়েস করিলেই তাহা অটোমেটিক যন্ত্রের মত চলিবে না, পৌরাণিক প্রথায় চলিতে বলিলেও তাহা সম্ভব হইবে না। তাহা ঝুটো, কৃত্রিম পদার্থ তৈয়ার করিয়া তুলিবে। কারণ পূর্ব্বাপর নিবিড় রহস্য-যোগ ইহাদের নাই।

প্লানচেট নামক ভৌতিক যন্ত্রের পরিচালনা অদৃশ্য জীবের প্রেরণায় ঘটে বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। তেমনি, যুগাগত অপ্রত্যক্ষ মনন ও ধারণা হস্তকে সুশিক্ষিত করিয়া পেশীকে আয়ত্ত এবং শিল্পীর ধ্যান-নিবিষ্ট চিত্তের তালে তালে নৃত্যপরায়ণ করিয়া তোলে।

জাপানী আর্টে ইহাকে অন্তর্গূঢ় জ্ঞান বলে। ইহা শুধু জড় ধর্ম্মের ব্যাপার নহে, এক জনের বা এক দিনের খেয়ালে এই হৃন্মন্দ্র লাভ করা যায় না। অর্থের জোরে ইহাকে মুকুলিত করা যায় না। ইহাতেও শ্রবণ-মনন-নিধিধ্যাসনের প্রেরণা আছে। বাহিরের আগাগোড়া কৃত্রিম বা অনুকৃত পরিচ্ছদ ও কলার এই পরমার্থ পদার্থকে সুলভ করিয়া তুলিবে না।

জাপানের চিত্রকলা, প্রণালী বিষয়ে এসিয়ার এই সনাতন কথাকে চিরকাল অনুসরণ করিয়াছে। জাপানী চিত্রকলা সম্বন্ধে কোন লেখক বলেন, * "যখন শিল্পী স্বীয় বিদ্যার

*"It is only when the artist has attained to complete mastery of his craft, when his hand works freely and merely when

উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করে, যখন তাহার শিক্ষিত হস্ত অনায়াসে এবং দ্রুত নিশ্চয়তার সহিত অগ্রসর হয়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যখন কলা-সংজ্ঞানের নৈসর্গিক তাড়নায় হস্তপেশী চালিত হয়, অর্থাৎ আত্মনিহিত কলাদর্শকে যখন হস্ত সহজে অনুগমন করে, যখন এ বিষয়ে কৃত্রিম পরিশ্রম বা চেষ্টা প্রয়োজন হয় না, তখনই শিল্পী আচার্য্যের পদের দাবী করিতে পারে। এই নৈসর্গিক প্রেরণার মূলে বৌদ্ধধর্ম্মান্তর্গত 'জৈন' সম্প্রদায়ের গুপ্ত রহস্যমূলক শিক্ষার সহিত গূঢ় সম্পর্ক প্রত্যেক জাপানীর মনের মাঝে গাঁথা আছে।"

কলার এই পরম আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা যাহার পরিস্ফুট হয় নাই, এ রাজ্যে তাহার প্রবেশ উষ্ট্রের সূচি-ছিদ্র প্রবেশ অপেক্ষাও দুরূহ এবং তাহার কলা চেষ্টাও অনুকম্পার ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

ইউরোপের তুলনামূলক ঐতিহাসিক প্রণালী (Historico-comparative method) অনেক উদ্ভট পক্ষকে পরিহার করিয়া জাতি বা ব্যক্তির শিক্ষা, সাধনা, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতিকে বাস্তবিকই সুবোধ্য করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু এ পদ্ধতিটা যে কি, এ সম্বন্ধে জ্ঞান যতটা বিস্তৃত, ইহার সুপ্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান ততটা অল্প; কারণ জাতির জটিল প্রাচীন হৃদয়-অরণ্যে প্রবেশের অধিকার বহু সাধনা বা সুকৃতি দ্বারা লাভ করা যায়। উচ্চাশা মাত্র এক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত নহে। এজন্য ইউরোপের অভিজ্ঞ সুপণ্ডিতগণও বহু ইতিহাস পাঠ ও রচনা করিয়া চৈনিকের হৃদয়-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল না, ভারত বা জাপানের কথা নাই বলিলাম।

কাজেই প্রাচীনতার দোহাই দিয়া প্রাচীন হওয়া সম্ভব নহে, প্রাচীনের ধর্ম্মে অনুসিক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং এই ধর্ম্মসাধন, কলা রাজ্যেই হউক বা বিজ্ঞান রাজ্যেই হউক, নানা সংযম, অধ্যয়ন এবং অনুশাসন দ্বারা সম্ভব হয়।

কাজেই বঙ্গিনী কলা সমূহের সৃজন প্রবৃত্তির অন্তরালে কলা সাধকের বহু সৌভাগ্য নিহিত থাকে, তাহা যন্ত্র বা কোন বিশিষ্ট পদ্ধতির পরিমাপ্য নহে। বাহিরের আকারকে কেতাবে বা কথায় বন্দী করা যায়, কিন্তু অবগুণ্ঠনবতী চিত্তসুন্দরীর মর্ম্মস্পন্দনকে কারাবদ্ধ করা ততটা সহজ নহে।

নৃত্য কলার মাঝে প্রধান উপকরণ ললিত চরণদ্বয়। উহার নূপুর-শিঞ্জিতের মাঝে সুলক্ষিত ও সুনির্দ্দিষ্ট সুর ঝঙ্কৃত হয়, এবং গতির মাঝে রহস্যময় আবর্ত্ত সৃষ্ট হয়। তেমনি, চিত্রকলার মাঝেও অঙ্গুলির অগ্রভাগে বহু যুগের সাধনা ফলে আত্ম-বিস্মৃত পরম রমণীয় লীলাভঙ্গী হিল্লোলিত হয়। তাহা শিল্পরাজ্যের একটা বহুকালের উপার্জ্জিত সম্পত্তি, সন্দেহ নাই। হৃদয় সরোবরের এক তীরে চিত্তের উচ্ছ্বাস এবং অন্য তীরে রেখাচতুরে তাহার সুবিন্যস্ত, সুলক্ষণযুক্ত প্রয়োগ—এই উভয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগ যেন সন্ধ্যামুখে চক্রবাক-মিথুনের পরস্পরানুগ চিত্তগতির ন্যায় পরস্পরকে পরমার্থ করিয়া তোলে।

above all the muscular action answers directly to the call of the artistic consciousness—some would say of the soul—without any laborious direction being given with individual stroke that the craftsman can lay claim to the title of a master. It is an idea that is intimately mixed up in the native mind with certain esoteric teaching of the Buddhist religion especially with those of the Zen sect"

Edward Dillon